

শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত ॥ মানদা দেবী



শিক্ষিতা

পাঠিতার আচা-চরিত

কুমারী—শ্রীমতী মানদা দেবী প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

দেড় টাকা।

Publisher—
R. CHAKRAVARTTY
Kumaruli.
Mymensingh.

প্রথম সংস্করণ—আশ্চিন—১৩৩৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্তিক—১৩৩৬
তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ—১৩৩৬
চতুর্থ সংস্করণ—পৌষ———১৩৩৬

হিন্দি সংস্করণ—১।।০
ইংরেজী সংস্করণ—২।

PRINTER—
S. DAS
SINGHA PRINTING WORKS.
34-1B, Badur Bagan Street, Calcutta.

আমাৰ কৈফিয়ত

পুস্তকেৱ নাম দেখিয়া অনেকেই হয়ত মনে কৱিবেন যে এই প্ৰকাৰ
জীবনী লিখিবাৰ উদ্দেশ্য কি ! মহৎ জীবনীৰ উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তাহা
সমাজেৰ পূৰ্ব চিত্ৰ নহে। আমাৰ জীবন মোটেই মহৎ নহে, অধিকন্তু
ঠিক তাহাৰ বিপৰীত ; কিন্তু পুস্তকেৱ উদ্দেশ্য মহৎ। আমি পাপী,
কলঙ্কিনী, ঘণ্টেৰ প্ৰাণী নহি—মুতৰাং আমাৰ জীবনেৰ খাটি কথাগুলি
আমি যেমন অকপটে বলিতে পাৰিব, কোন মহৎই তাহাৰ জীবনেৰ বটনা
তেমন অকপটে বলেন নাই। বলিতে পাৰেন না। পাপেৰ স্বৰূপ
চিনিয়া রাখা প্ৰয়োজন। পাপ জিনিষটা যে কি কৈশোৱে তাহা বুঝিতে
পাৰি নাই বলিয়াই আজ আমি—আমি কেন—আমাৰ মত সহস্র সহস্র
নারী পতিতা।

বাৰবনিতা-জীবনে যে দুঃখ কষ্ট এবং অনুত্তাপ ভোগ কৱিয়াছি
তাহাৰই শুভি লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। যাহাৱা আমাদেৱ
জীৱনকে সুখময় মনে কৱেন—আমাদেৱ সংস্পৰ্শে আসিতে আগ্ৰহাবিত
তাঙ্গাৱা বুঝিবেন এ পৃথিবীতে যদি নৱক পাকে তবে তাহা আমাদেৱ
জীবন।

আমি সমাজেৰ ঘণীতা, অস্পৃষ্টা—সমাজে আমাৰ স্থান নাই, স্থান
থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধু-বেশী লম্পট আমাদেৱ সংস্পৰ্শে
থাকিয়াও সমাজেৰ উচ্চস্থান অধিকাৰ কৱিয়া আছেন, আমাৰ জীবনীতে
তাহাদেৱ কতিপয় চিত্ৰ দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পাৰিবেন।
এই ভঙ্গেৰ দল কি প্ৰকাৰে অবোধ বালিকাৰ সৰ্বনাশ কৱে, তাহাৰ চিত্ৰ
দেখিয়া স্মৃতি হইবেন।

• আমাৰ এই আত্ম জীবনীতে ৩শিবনাথ শাস্ত্ৰী, ৮স্তাৱ সুৱেল্দ নাথ,
৩দেশবন্ধু দাশ, ৩বোমকেশ চক্ৰবৰ্তী, ৩অধিনীকুমাৰ দত্ত, ৩জনীয়া

শ্রীযুক্ত বাসন্তী দেবী, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, উর্মিলা দেবী, শুনিতী দেবী,
মোহিনী দেবী, সরলা দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, লেডী
অবলা বসু, কামিনী রায়, জ্যোতির্ময়ী গাঞ্জুলী, মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী,
রমলা গুপ্তা, লীলাবতী দাশ,

শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহেশচন্দ্র আতঙ্কী ; কাজি
নজরুল ইচ্ছান ও তৎপত্তী, মতিলাল নেহরু ও তৎকন্ত্ব। এবং সৈয়দ
হসেন, কুমার গোপীকারমণ রায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টো-
পাধ্যায়, আক্রান্ত খাঁ, আবদুল রহিম, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, আচার্য
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বীরেন শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার,
প্রতাপ গুহরায়,

৩বঙ্গিম চট্টোপাধ্যায়, ৩অমৃতলাল বসু, দীনবক্তু মিত্র, দ্বিজেন্দ্র লাল,
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত,

স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচিদানন্দ, তারকেশ্বরের
মোহন্তি প্রতিম মহোদয় ও মহোদয়ার নাম প্রয়োজন বশতঃ উল্লিখিত
হইয়াছে। আমার মত নৃতন লেখিকার অক্ষমতার দোষে যদি তাঁহাদের
সুনামের কোন হানি হইয়া গাকে এজন্ত তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এবং
মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই জীবনীতে আমার ফটো চিত্র দিতে ইচ্ছা করিয়া বিজ্ঞাপনঃ দেওয়া
হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভূতপূর্ব শিক্ষক মুকুলচন্দ্র বানার্জি, উকিল
মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাহা দেওয়া হইল না।

বিনিতা
শ্রীমতী মানদা দেবী

ছি'তীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বিশ্বনাথের কৃপায় কয়েক দিনের মধ্যে পুস্তকের ছি'তীয়বার মুদ্রনের প্রয়োজন হইল। এই সংস্করণে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে।

আমার এই জীবনীতে ইঞ্জিনীয়ার কল্যা স্কুলটীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। স্কুলটীর ভাতা এজন্য পুস্তকের প্রকাশক এবং আমার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়নের উদ্দেশ্যে, উকিল দ্বারা এক নোটোশ দিয়াছেন। নোটোশে বলা হইয়াছে—“স্কুলটী পতিতা নহে, সে আমার বাড়ী যাইত না, আমি ভদ্রলোকের কল্যা জানিয়া গৃহস্থ হইয়াও সে আমাকে তাহাব বাড়ীতে যাইয়া তাহার সঙ্গে মিশিবার স্বযোগ দিয়াছিল। স্কুলটী কৃষ্ণকুমার বাবুর জামাতার ঘড়ি চুরি করে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।”

নোটোশের কোন জবাব আমি দেই নাই এবং দিব না, মোকদ্দমার প্রতীক্ষায় রহিলাম, যদি মোকদ্দমা হয় তবে পতিতা সমাজের এমন ঘটনা বাহির হইবে যাহাতে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

আমার এই জীবনী আমার নিজের লেখা কি অন্য পুরুষের লেখা, তাহা লইয়া একদল লোক গাথা ঘামাইতেছেন শুনিতেছি। নারী সম্বন্ধে পুরুষের নানা প্রকার হীন ধারণার জন্যই নারী আজ বিশ্বে সমানাধিকার দাবী না করিয়া পারিতেছেন না। যদি তাহারা কেবল ইহাই ভাবিয়া গাকেন যে—পতিতার কি বই লিখিবার ক্ষমতা আছে—ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে—পতিতগণ যদি বই লিখিতে বা পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন, তবে পতিতাগণ পারিবে না কেন? বিশেষতঃ পতিতাগণের লিখিত পুস্তকের যথেষ্ট আদর আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতিভাব পরিমাপ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রি দ্বারা হয় না। পূজনীয়া শ্রীযুক্তা অনুকূপা দেবী, নিরূপমা দেবীর কোন ডিগ্রি নাই, ইহারা হিন্দু ধর্মের সেকেলে দেবৈ, রিয়েলিষ্টিক আর্টেরও কোন ধার ধারেন না, কিন্তু ইঁহাদের লেখনী হইতে যেমন লেখা বাহির হইয়াছে এ পর্যাপ্ত কোন

উপাধিধারিনী তেমন সর্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক' যে লিখিতে পারেন নাই ; তাহা
সর্ববাদী সম্মত ।

“তোটে পতিতার স্থান” নামক একটি অধ্যায় এই পুস্তকের জন্য
লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কেবল বিশিষ্ট রাজনৈতিকের মতামত গ্রহণ
না করিতে পারায় এবাবেও মুদ্রিত হইল না । * * *

আমাৰ জীবনীতে যাহাদেৱ প্ৰতি সামান্য ইঙ্গিত আছে তাহাদেৱ
নিকট আমি ক্ষমা প্ৰার্থনা কৰিতেছি । কাহারও প্ৰাণে ন্যাথা দিবাৰ
জন্য এ পুস্তক লিখিত হয় নাই । বৰ্তমান সমাজেৰ খাটি চিৰ দেখাইয়া
সমাজপতিগণেৰ মনোযোগ আকৰ্ষণহই আমাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য । আমাৰ
পৰিশ্ৰম সাৰ্থক হইয়াছে—সমাজে সাড়া পৱিয়াছে ।

নাৰী পতিতা হইলে তাহার নাকি কোন মূল্যাই থাকে না । তাহাকে
অপমান কৱিলেও আইন অনুসাৰে “মান হানীৰ” দাবী চলে না, কিন্তু
“পতিত” পুৰুষেৰ বেলায় এই আইনহই কাৰ্য্যকাৰী—কাৰণ, আইন প্ৰণেতা
পুৰুষ । আমাৰ উকিল বলেন—আইনেৰ এই কৃটিৰ জন্যহই, স্বৰূচি
পতিতা নহে—এই মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছে । কংগ্ৰেস,
কাউন্সিলে যাহারা নাৰী পুৰুষেৰ সমানাধিকাৰ দাবী কৱেন তাহারা কি
আইন সত্ত্বয় ইহার প্ৰতিকাৰ প্ৰার্থী হইতে পারেন না ? প্ৰকাশ্যে
পতিতাদেৱ প্ৰতি সহানুভূতি দেখাইলে নিন্দাৰ কোন নৃতন কাৰণ উপস্থিত
হইবে না । কাৰণ কংগ্ৰেস ও কাউন্সিলেৰ এই সকল মাৰ্কামাৰা সদস্য-
দিগকে দেশেৰ লোক ভাল কৱিয়াটি জানে । যদি আগামী কংগ্ৰেস ও
কাউন্সিলে আমাদেৱ এই দাবী কেহ উপস্থিত না কৱেন তবে মনে কৱিব
যাহারা সমানাধিকাৰেৰ জন্য চিংকাৰ কৱেন তাহারা নিচক মিথ্যাবাদী ।
হয় আমাদেৱ দাবী পূৰণ কৱ—না হয় ‘পতিত’ দিগকে ও কংগ্ৰেস
কাউন্সিল অগৰা অন্ত কোন কাৰ্য্য হইতে বহিস্থিত কৱিবাৰ জন্য আইন কৱ ।

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

অযাচিত অনুকূল ও প্রতিকৃতি সমালোচনার ফলে একমাস মধ্যে তৃতীয় সংস্করণের চারি হাজার পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইল। এ সংস্করণেও সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে।

কয়েকটী সুনীতিবাদী কাগজ এই পুস্তকে অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়াছেন এবং তদনুরূপ সমালোচনাও করিয়াছেন; পক্ষান্তরে দেশ বরেণ্য ও শ্রদ্ধেয় বহু সমাজমৈতা ও সাহিত্য-রথী এই পুস্তক সম্বন্ধে উক্ত সুনীতিবাদিগণের বিরুদ্ধ মত সমালোচনা করিয়াছেন ও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকখানি পুস্তকের সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “জননীর স্তন হইতে শিশু দুগ্ধই গ্রহণ করে কিন্তু জলৌকা বা ঝঁক সেই স্তন হইতেই কুণ্ডির ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারে না।”

উপরোক্ত সুনীতি বাগীশদিগের সম্বন্ধে আমাকে কয়েকটী কথা বলিতে হইতেছে।

“চেট বউর বাঁট দুখানির আস্বাদন” যে খবরের কাগজ ভদ্রসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন এবং যে শ্রেণীর সাধুবেশী লম্পট এবং ‘ম’ কারের উপাসক নারীকে প্রগতি প্রাপ্তি করাইতে অঙ্গহীন হইয়াছেন তাহারাই মাত্র গন্ধ পাইয়াছেন। তৎখন এই ভাবিয়া যে এ’রা বিশ্ব-সাহিত্য ত দূরের কথা সংস্কৃত কুমারসন্তুষ্ট থানিও যেন পড়েন নাই। পড়িলে ‘কুমার সন্তুষ্ট’ আজ বি, এ, ক্লাসের পাঠ্যতালিকায় স্থান না পাইয়া ইহাদের মানবহিতকর উপদেশে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ‘প্রোক্রাইবড়’ পুস্তক শ্রেণীর অঙ্গীভূত হইত।

ছাগ মনস্তুষ্ট বিশ্লেষণের অন্ত্যগ্র পলাঞ্চু গন্ধী গো-শূকর মাংস যে সকল সাহিত্যরথিগণের অনায়াসে হজম হইয়াছে হরিণ মাংসে তাহাদের সহসা এবস্পৰকার অকুচি কি করিয়া সন্তুষ্ট হইল তৎসম্বন্ধে কোন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কাগজ লিখিয়াছেন... পুস্তকে অনেক অপ্রিয় সত্য আলোচিত হইয়াছে।...

ঁহাদের হাঁড়ি আজিও হাটে ফাটে নাই, তাহারাও বুঝিবা এই ফাটে উয়ে
চিকার করিতেছেন।”

সুরুচির একনিষ্ঠ উপাসক, লঙ্ঘপ্রতিষ্ঠ কোন এক মাসিকের পৌর
সংখ্যায় শ্লীলতার পরাকার্তার এক চিত্র বাহির হইয়াছে। উহাতে আছে
তিন জোড়া যুবতীর স্তনের ছড়াছড়ি মাত্র। সুরুচি বাগীশ সম্পাদক
মহাশয় শ্লীলতার মাপ কাঠি খানি কোথায় লাভ করিয়াছেন জানিতে
কৌতুহল হয়। ইতিহাসের দোহাই দিয়া হয়ত সম্পাদক মহাশয় আত্মরক্ষা
করিতে চাহিবেন ; কিন্তু চিত্রে ইতিহাস টিকিবে কি ?

রাজা ও নহেন শুষিও নহেন এমন কোন ৩সমাজ সংস্কারক (?)
বৎকালে যবন উপপন্নীর সঙ্গে উভয়ে উলঙ্গ অবস্থায় মন্ত পানেরত, ইহাদের
তৎকালীন চিত্র সন্তুষ্টঃ উপরি উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের চক্ষে অশ্লীল
দেখাইবে ; কিন্তু কেহ ত আজি পর্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন চিত্র প্রকাশ করিয়া
ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার অথবা কুচি জ্ঞানের পরিচয় দেন নাই।

যে সমাজের সিদ্ধ মহাপুরুষকে এরূপ অবমাননাকর চিত্রে অঙ্গিত
করা হইয়াছে বাঙ্গালায় তাঁহাদের লোক সংখ্যা অতি নগন্ত। নতুবা
এই স্পর্কা সন্তুষ্ট হইত কি ? পতিতার পদ্মেও কথা বলিবার কেহ নাই
বলিয়াই কি সুরুচিবাগীশের দল অমন লম্বা চওড়া স্পীচ বাড়িতে
সুরু করিয়াছেন ? এ চাল বাজিতে দেশের লোক আর ভুলিবে বলিয়া
মনে হইতেছে না।

দৈনিক বঙ্গবাণী ইঙ্গিত করিয়াছেন যে পণ্ডিত শ্রাম সুন্দর চক্ৰবৰ্তী
এই পুস্তকের লেখক এবং মনস্বী জিতেন্দ্ৰলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকের
লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। পতিতা সমাজে যদি ইচ্ছাপূর্বক কাহারও
উপর মিথ্যা দোষারোপ ক’র—তাহার বিচার হয় সন্মার্জনী দ্বাৰা—এই
লেখক মহাশয় “পতিত” কিনা না জানায় তাঁহাদের দলপতির উপর এই
মিথ্যা উক্তিৰ বিচারের ভাব অর্পণ কৱিলাম।

শিক্ষিতা

পতিতার আত্মচরিত

প্রথম

বাল্য

১৩০৭ সালের ১৮ই আষাঢ় তারিখে আমি জন্ম গ্রহণ করি। আমার পিতা কলিকাতার এক সন্ত্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ। আমি তাঁহার প্রথম সন্তান। পিতার নাম ও পরিচয় প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তিনি, তাঁহার জ্ঞাতি বৃটুম্ব, সন্তান-সন্ততি এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ অনেকেই এক্ষণে জীবিত রহিয়াছেন। সমাজে তাঁহাদের মান মর্যাদা কম নহে। আমার এই আত্মচরিত হয়ত তাঁহাদের হাতে পড়িতে পারে। আমি তাঁহাদিগকে বিত্রিত করিতে চাহি না।

আমার পিতামহ একজন সঙ্গতিপন্থ গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতাতে তাঁহার চারিখানা বাড়ী এবং নগরের উপকণ্ঠে একখানা বাগান বাড়ী ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আমার পিতা হাইকোর্টের উকৌল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার বেশ জমিয়া উঠে, বাহিরেও তিনি মাঝে মাঝে যাইতেন।

আইন কলেজ পড়িবার সময় আমার পিতার বিবাহ হইয়াছিল। তখন আমার পিতামহ উৰ্বিত। আমার মাতুল পরিবারও কলিকাতায় বাস করিতেন: তাঁহারা বিশেষ অর্থশালী ছিলেন

না—কিন্তু বংশ মর্যাদায় উচ্চ এবং ঝুপে অতুলনীয় সুন্দরী বলিয়া আমার মাতাকে পুত্র-বধু করিবার জন্য পিতামহ বিশেষ আগ্রহাত্মিত হইয়াছিলেন। আমার জন্মের দুই বৎসর পর আমার পিতামহের মৃত্যু হয়।—ঠাকুরদাদার কোলের শুখলাভ যে আমার ভাগ্যে ঘটিয়া-ছিল—কেবল মাত্র কল্পনাতেই সেই স্মৃতি জাগিয়া আছে।

কল্পনা বলিয়া আমি শিশুকালে অনাদৃত হই নাই। পিতার বন্ধুগণ কেহ কেহ বলিলেন, “প্রথম কল্পনান, সৌভাগ্যের লক্ষণ”। কথাটা হাস্ত পরিহাসের সহিত বলা হইলেও, তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে বোধ হইল। আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্বে পিতা আইন বাবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। দিন দিন তাহার উন্নতি দেখা গেল। কিছুকাল মধ্যেই আমার পিতা কোন স্থয়োগে বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের একটা ছোট জমিদারী নীলামে ক্রয় করিলেন।

শৈশব অবস্থায় আমার শরীর রুগ্ন ছিল। মা আমাকে লইয়া সর্ববদ্ধ বিরত থাকিতেন। পিতামহ আমার স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। মৃতুশষ্যায় তিনি নাকি আমার দিকে চাহিতে চাহিতে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। আজ মনে হয়, সেই ঋষিতুলা বৃক্ষ বুঝি তাহার শেষ নিধাস আমার প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাই আমি মরিতে মরিতেও বার বার বাঁচিয়া উঠিতেছি।

আমার যখন তিনি বৎসর বয়স, তখন একবার কঠিন জরে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আমার জীবনের অশা ঢাঢ়িয়া দিয়াছি লেন। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ সেন আমার চিকিৎসায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া ছিলেন।

মা নিত্য শিবপূজা করিতেন। একদিন দুশ্চিন্তার উদ্বেগে
নিতান্ত কাতর চিত্তে তিনি পূজার ঘরে অচেতন হইয়া পড়েন।
জ্ঞান সঞ্চার হইলে মা বলিলেন, “খুকুমণি সেরে উঠবে, আর কোন
ভয় নেই।” তিনি অন্তরে অন্তরে তাঁহার অভীষ্ট দেবের নিকট
হইতে কোন আশ্বাস পাইয়াছিলেন কিনা কে জানে, তার পর
হইতে বাস্তবিক আমার দেহ একপ্রকার ঔষধাদি ব্যতীতই নৌরোগ
হইতে লাগিল। চারি মাসের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ স্ফুল্ল হইলাম।

একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আমার
দেহকান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমার পরিপূর্ণ
অবয়ব—উজ্জ্বল মুখ-শ্রী—দীর্ঘ নিবির কুন্তলশোভা—আনন্দোৎফুল্ল
চলন ভঙ্গী দেখিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ সকলেই
আশ্চর্যাপ্নিত হইল। আগি পূর্বে ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলাম;
কিন্তু এই রোগ ভোগের পর আমি কিছু চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলাম।
বিস্কুট লজেঞ্জুস কিনিবার জন্য মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া
বড় রাস্তার উপরে মনোহারী দোকানে ছুটিয়া যাইতাম—যুড়ী
ধরিবার জন্য আমাদের বাড়ীর প্রশস্ত চাদে দৌড়াদৌড়ি করিতাম—
অবশ্য পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল না। বির সঙ্গে কথনও
কথনও তাহাদের বাড়ীতে চলিয়া যাইতাম। চাকরেরা আমার
দুষ্টামীতে অতির্ষ্ট হইয়া উঠিত। বাবার বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া
আমি গোলযোগ আরম্ভ করিতাম। বাড়ীতে আর ছোট ছেলে
মেয়ে কেহই ছিল না। একমাত্র আমার চীৎকার ও হাস্ত কলরবে
এত বড় বাড়ীখানি সর্ববদ্ধ মুখরিত থাকিত। বাবার নিকট আমার
ছেলে বেলার এই সকল কথা শুনিয়া আমি সঙ্খুচিত হইতাম।

স্নান করা আমার অতি আনন্দের বিষয় ছিল। মায়ের অনুরোধে বাবা আমার জন্য বাড়ীর উঠানে একটা বৃহৎ চৌবাচ্চা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। তার মধ্যস্থলে সুন্দর ফোয়ারায় জল উঠিত। ছয় সাত বৎসর বয়সে আমি সাঁতার শিখিয়াছিলাম। স্নান করিবার সময় আমর সমবয়সী প্রতিবেশী ছেলে খেয়েদের ডাকিয়া আনিতাম। আমরা সকলে চেঁচামেচি হৃষ্টোপাটি করিয়া সেই বৃহৎ চৌবাচ্চার জলে হাঁসের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলায় মত্ত থাকিতাম। মা আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন, সেই জন্য বাবা আর কিছু বলিতেন না।

আমার আর একটা অভ্যাস ছিল—প্রতাহ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হওয়া চাই। যে দিন বাবা বাহিরে যাইতেন না, সেদিন আমি মায়ের সঙ্গে মোটরে চড়িয়া যাইতাম। আমার এক মামাত ভাই আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। তাঁহার নাম ছিল নন্দলাল, তাঁহাকে আমি নন্দ দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার সঙ্গে কখনও কখনও হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইতাম। রাস্তার দুইধারে সুন্দর সুন্দর সাজান দোকানপাট, টুমগাড়ী, আলোকমালা, অসংখ্য লোক চলাচল, সেসব দেখিয়া আমার মনে কি আনন্দ হইত! আলিপুরের চিড়িয়াখানা, চৌরঙ্গীর যাদুঘর, হাবড়ার পুল, পরেশ-নাথের বাগান, কালীঘাটের মন্দির এসকল আমি বালিকা বয়সেই অনেকবার দেখিয়াছি।

পুতুলখেলা অপেক্ষা পাখী পুষ্পিবার সথই আমার ছিল বেশী। পায়রা, ময়না, টায়াপাখী, কাকাতুয়া, হৌরেমন, শালিক প্রভৃতি নানপ্রকার সুন্দর পাখী বাবা আমাকে আনিয়া দিতেন। কুকুর

বিড়াল আমি ভাল বাসিতাম না। ফুলগাছেও আমার মন আকৃষ্ট হইত না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাখীর নেশা আমার কমিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার এক মৃত সন্তান প্রসবের সময় আমার মায়ের মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলাম। মৃত্যু কি, তাহা তখন আমি বুঝিতাম। আমাকে কেহ মিথ্যা বাকে তুলাইতে পারিল না—কেহ আমাকে সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। আমি চৌৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিলাম। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু আমি ঢিনশির ঢাগশিশুর মত ছট্টফট্ট করিতে করিতে বাবার কোল হইতে নামিলাম। প্রতিবেশীগণ মায়ের মৃত দেহ পালক্ষের উপর পুষ্প-মালায় সাজাইয়া কাঁধে করিয়া লইয়া গেল। আমি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলাম। আমার মনে আছে, কতকদূর যাইয়া ফুটপাতের উপর আচড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি, বাহকেরা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পালক্ষের পশ্চাদিকে মায়ের আল্তা মাথান পা-দুখানি বাহির হইয়া রহিয়াছে; তাহাই আমার দৃষ্টি পথে।

আজ আমার দুঃখময় জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়া চক্ষুর জল ঝরিতেছে। কত দিন কত দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি—আমার মনে হইয়াছে, তাহা মায়ের সেই চরণযুগলে নিপতিত হইয়া তাঁর শুক্র অলক্ষ্মক-রাগকে আরও উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুতে বাবা খুব কাঁদিয়াছিলেন। তিনি দিন পর্যন্ত তিনি কিছু আহার করেন নাই। অবশেষে বন্ধুদের সন্ধিবন্ধ

অনুরোধে খাত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদার শয়নগৃহের প্রাচীরে মায়ের একখানি বৃহৎ সিপিয়া রংএর ব্রোমাইড এনলার্জেমেণ্ট, ছবি ছিল। আমার সপ্তম জন্মতিথিতে বাবা আমাকে উহা উপহার দিয়াছিলেন। সাড়ে সাত শত টাকা ব্যয়ে তিনি এই ছবিখানি বিলাত হইতে তৈয়ারী করাইয়া আনেন। মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা নিতা এক জড়া ফুলের মালা দিয়া ছবিখানিকে সাজাইতেন।

মায়ের জীবদ্ধাতেই আমি বেথুন স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলাম। তাহার মৃত্যুকালে আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। বাড়ীতে একজন গৃহ শিক্ষক আমাকে ও নন্দ দাদাকে পড়াইতেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আমাকে স্কুলে হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। বাড়ীতে অধিক সময় পড়াইবার জন্য একজন ভাল শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাকে সর্ববদা কাছে কাছে রাখিয়া শোকবেগ কঢ়কটা প্রশংসিত করিবার জন্যই বোধ হয় বাবা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মাহা হটক ইহাতে আমার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হইল না।

চতুর্থ মাস চলিয়া গেল। তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই বোমার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। নেতাদের নির্বাসন, যুবকদের কারাদণ্ড, বিপ্লববাদীদের গ্রেপ্তার, বোমাওয়ালাদের ফাঁসী, এই সকল ভীষণ বাপারে দেশময় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। নানাস্থানে সভা সমিতি, লাঠিখেলার আঢ়া প্রভৃতি স্থাপিত হইল। আমার পিতা এই আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন। নন্দ দাদা আমাকে মাঝে মাঝে স্বদেশী সভায় লইয়া যাইতেন। সেখানে কত উত্তেজনাময় বল্ক তা শুনিতাম।

• একটা কথা বলিতে তুলিয়া দিয়াছি। আমি বেশ গান গাহিতে পারিতাম। স্বাভাবিক শক্তিতেই আমার স্বর তাল জ্ঞান ছিল, কণ্ঠস্বরও নাকি আমার সুমিষ্ট—যাঁহারা আমার গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই প্রশংসা করিতেন। সঙ্গীতের ক্ষমতা আমার কিন্তু জন্মিল, আমি বুঝিতে পারি না। আমার পিতামাতা কেহই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। বাবা আমাকে একটী খুব ভাল টেবিল হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছিলেন। এক জন শিক্ষক আমাকে এস্রাজ বাজনা ও গান শিখাইতেন।

একদিন দেখিলাম নন্দদাদা দুইখানি লম্বা ছোরা কিনিয়া আনিয়াছে। আমার সম্মুখে টেবিলের উপর ছোরা দুইখানি রাখিয়া বলিল “মানি, তোকে ছোরা খেলা শিখতে হবে।” আমি একখানি ছোরা হাতে লইয়া বলিলাম, “সে কি নন্দ-দা?” নন্দ-দা আর একখানি ছোরার বাঁট ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ আমার বুকের দিকে লঁ” কারল। অপর হস্তে আমার ডান হাতের কঙ্গি ধরিয়া এবন ভঙ্গিমায় দাঁড়াইল, যেন সে সত্যই আমাকে মারিতে উচ্চত। আমিও বা হাতে নন্দদা’র ডান হাতের কঙ্গি ধরিয়া ফেলিলাম। সে বলিল “এই ত ঠিক, এমনি করেই ত আটকাতে হয়।” আমি কিছুদিন পূর্বে এক স্বদেশী সভায় ছেলেদের ছোরা খেলা দেখিয়াছিলাম, আমি বলিলাম “মেয়েদের এসব শিখে কি হবে?” নন্দলাল বলিল “কেনরে মানী, শুনিস্ নি সেই গান,—“আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধরগো”

আমি বলিলাম “হঁ,—মনে আছে।” এই বলিয়া আমি

তখন টেবিল হারমোনিয়মের সমুথে' লাইয়া বসিলাম। 'তাহার ঢাক্কা খুলিয়া চাবি টিপিয়া গলা ঢাঢ়িয়া গান ধরিলাম,—

আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধরগো,—

পরিহরি চারু কনক ভূষণ গৈরিক বসন পরগো

আমরা তোর কোটী কুসন্তান,

ভুলিয়া গিয়াছি আত্ম বলিদান,

করে মা পিশাচে তোর অপমান প্রতিকার তা করগো।

গান শেষ হইলে বাবা আসিয়া বলিলেন “কিরে, খুক্ত—
তোদের কি হচ্ছে ?” নন্দ-দা মুহূর্তের মধ্যে ছোরা দুখানি লাইয়া
আর এক দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। আজও আমার সে দিনের
ঘটনা বেশ মনে আছে।

সে দিন বাবা আমাকে এক স্বদেশী সভায় লাইয়া গেলেন।
এই গানটী আমি সভাস্থলে গাহিলাম। সকলে আমার
খুব প্রশংসা করিল। উস্তুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভার সভা-
পতি ছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই—উহাতেই আমার
সর্ববনাশ হইতেছে। এই সভাতে বাবা এক বক্তৃতা দিলেন।

তখন দামোদরের বন্ধ্যায় বর্দ্ধমান সহর ও তাহার নিকটবর্তী
বহুদূরব্যাপী স্থানসমূহের গৃহস্থগণ আশ্রয়হীন এবং দুর্দশাগ্রস্ত
হইয়াছিল। তাহাদের দুরবস্থা মোচনের জন্য সাহায্য ভাগীর
খোলা হয়। দেশের সহাদয় জনসাধারণ তাহাতে অর্থদান করেন।
অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতার খিয়েটোর সিনেমায়
বেনিফিট নাইট অর্থাৎ সাহায্য রজনী ও অপর নানাবিধি আমোদ
প্রমোদের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে বালু আমাকে কয়েকবার থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। নন্দ দাদাও সঙ্গে যায়। থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গীত ও অভিনয় দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার মনে আছে, আমি প্রথম নাটক অভিনয় দেখি—দেবীচৌধুরাণী ও আলিবাবা। দেবী-চৌধুরাণীর ‘বীণা—বাজেনা কেন’ এবং আলিবাবা ‘চি চি এতা জঙ্গল’ এই দুইটী গান আমি এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছিলাম যে আমার পিতা অনেকবার বাড়ীতে আমার মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। রবিবার বায়স্কোপে যাওয়া আমার ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া উঠিল। কখনও নন্দ দাদা,—কখনও বা বাবা নিজে আমার সঙ্গে যাইতেন। কোন কোন রবিবারে আমি বাবার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে যাইতাম। আমার পিতা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতিতে তিনি ব্রাহ্মদের মত উদার ভাবাপন্ন ছিলেন।

মাতার ঘৃতুর পর হইতে বাবা প্রতিদিন মায়ের ছবিতে একটী ফুলের মালা দিতেন।
 এখন আর মায়ের ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া হয় না। বহুদিন যাবৎ একচড়া বেলফুলের মালা উহাতে শুকাইয়া ছিল, একদিন চাকর দেওয়াল ঝাড় দিতে উহা ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের কাহারও মনেই তাহাতে কোন চঞ্চলতা বা বিরক্তি আসে নাই।
 সকাল ছয়ট হইতে নয়টা—অপরাহ্ন একটা হইতে চারিটা মাস্টার মহাশয় পড়াইতেন। শনিবারে কখনও কখনও থিয়েটারে, রবিবারে বায়স্কোপে যাওয়া আমার নিয়মিত কার্য মধ্যে ছিল।

নন্দ দাদার চেষ্টায় ছোরা খেলা শিখিয়াছিলাম।—আমার ডান হাতে একটা বড় কাটার দাগ এখনও তার সাক্ষী। বাবার আদেশে ছোরা খেলা পরিত্যাগ করি। তার পরিবর্তে গল্লের পুস্তক পড়ায় আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমার গৃহশিক্ষক মহাশয় ইহাতে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

‘দেবীচৌধুরাণী’ নাটক অভিনয় দেখিবার পর আমি বোধ হয় ‘অমর’ ও ‘কপালকুণ্ডলা’ দেখিয়াছিলাম। মাষ্টার মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন, বক্ষিম বাবুর লেখা আসল বই না পড়লে, রস ও সৌন্দর্য উপলক্ষি হয় না। আমাদের বাড়ীতে তিনটী আলমারী বোঝাই অনেক পুস্তক ছিল। মাষ্টার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্য হইতে বক্ষিম বাবুর গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া দিলেন। আমি দিবারাত্রি সেই উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিলাম। সকল স্থানে বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তথাপি প্রাণে কেমন একটা অপূর্ব পুলকের সঞ্চার ইহত।

আমাকে দেখাশুনা করিবার নিমিত্ত আমার বিধবা পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার জেষ্ট্যা ভগিনী। আমার যাহাতে কোন কিছুর অনুবিধা না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি সর্ববদ্ধ দৃষ্টি রাখিতেন। একদিন আনি শুনিলাম, পিসিমা বাবাকে বলিতেছেন “হাঁরে খোকা এইত এক বৎসর প্রায় হ'য়ে এল। আর ত দেরী করা ভাল নয়। তোর শাস্ত্র জ্ঞান আচে—বংশ রক্ষা, পিতৃকুলের জলপিণ্ড, এসব তুই কি জানিস্ না।” আমি তখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

কিছুদিন পরে বাবা আমাকে পুনরায় বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া

দিলেন। আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। আমি স্কুলের গাড়ীতেই যাতায়াত করিতাম। কারণ—বাবা বলিলেন, তাঁহাকে এখন প্রায়ই মোটরে বাহিরে যাইতে হয়, সুতরাং আমাকে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাইতে ও স্কুল হইতে লইয়া আসিতে নিজেদের মোটর সকল সময় পাওয়া যাইবে না। গৃহ শিক্ষক মহাশয় সকালে ও সন্ধ্যায় দুবেলা আমাকে পড়াইতেন।

যতদিম মা বাঁচিয়া ছিলেন, আমি মায়ের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাইয়াছি। মায়ের মৃত্যুর পর আমি বাবার ঘরে পৃথক বিছানায় শুইতাম। একদিন বাবা আমাকে বলিলেন, “খুকু—তুমি তোমার পিসিমার কাছে ঘুমিও”। আমি কখনও পিতার অবাধ্য হই নাই। আর একদিন বাবা চাকরকে ডাকিয়া দেওয়ালে মায়ের ছবিখানা দেখাইয়া বলিলেন, “এই বড় ছবিখানা খুকুর পড়ার ঘরে টানিয়ে দিস্ত।” আমার জন্য দুইটি নৃতন বড় বুক্কেস্, একখানা বড় মেহগিনি কাঠের সুন্দর টেবিল ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহা আমার পড়িবার ঘরে সাজান হইল। মেজেতে পাতিবার জন্য সুন্দর কার্পেট আসিল। একটা কাট্পাসের খুব দামী দোয়াতদানী ও একটা ওয়াটারম্যানের ফাউণ্টেন পেন বাবা আমাকে দিলেন। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছিল; আমার পড়িবার ঘরের বিজলী পাখায় নৃতন রং করা হইল। আরও চারিখানা সুন্দর বিলাতী ল্যাঙ্কেপ ছবির সঙ্গে মায়ের ছবিখানাও সেই ঘরে শোভা পাইল। মাষ্টার মহাশয় আমার পড়িবার ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। আমি স্কুলের পড়ায়, নভেলে, থিয়েটার ও সিনেমার আমোদে নিমগ্ন।

এমন সময় এক বসন্ত প্রভাতে আমাদের গৃহবারে নহবতে

সুমধুর রৌসানচোকী বাজিয়া উঠিল । “প্রতিবেশী বন্ধুগণ ও” আঁচীয় স্বজন আনন্দ কোলাহলে মন্ত্র । পিসিমা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত । পিতাকে নব বর-বেশে সজ্জিত দেখিলাম । পুষ্পপত্রে শোভিত চতুর্দোল আসিয়াছে । শুভ সন্ধ্যায় শোভাযাত্রার আলোকমালা জলিয়া উঠিল । আমিও উৎসবে মাতিলাম । আমার পর্ডিবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাং মায়ের সেই ছবিখনির দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল । আমি মুহূর্তের জন্য স্তস্তিত হইয়া দাঁড়াইলাম ; আমার চক্ষে জল আসিল । তার পর ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইলাম । কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না । পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল—দেখিলাম বিমাতা আসিয়াচেন ।

ଦ୍ୱିତୀୟ

କୈଶୋରେ

କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ସବେର କୋଲାହଳ ଥାମିଲ । ଦିନ ଦିନ ଆମିଓ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଉପଲକ୍ଷ କରିତେ ଲାଗିଲାମ । ପିସିମାର ଥାକିବାର ଆର ପ୍ରୋଜନ ରହିଲ ନା । ନବ ବଧୁକେ ସଂସାର ଧର୍ମ ବୁଝାଇୟା ଦିଯା ତିନି ତ୍ରୟ ସାତ ମାସ ପରେ ଚଲିଯା ଗେଲେନ । ଆମି ତଥନ ହିତେ ପିସିମାର ସରେ ଏକାକିନୀ ଶୟନ କରିତାମ ।

ବିମାତା ବୟସେ ଆମାର ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଂସରେ ବଡ଼ ଛିଲେନ । ଆମାର ଦେହର ଗଠନ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଯାଯ ଆମାକେଇ ବଡ଼ ଦେଖାଇତ । ତିନି ଶୁନ୍ଦରୀ ଛିଲେନ—ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲେଖାପଡ଼ା ସାମାନ୍ୟ-ରୂପ ଜାନିତେନ । ତୀହାର ସହିତ ଆମାର ବନିବନାଓ ନା ହଇବାର କୋନ କାରଣ ଛିଲ ନା, କାରଣ ଆମି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମାର ପଡ଼ାଶ୍ଵନା ଲାଇୟାଇ ବାସ୍ତ୍ଵ ଥାକିତାମ ।

ବାବା ଅନ୍ତଃପୁରେ ଆସିଲେ, ବିମାତା ପ୍ରାୟଇ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଲେ ତୀହାର କାଢେ ଥାକିତେନ । ବିଶେଷ କୋନ ପ୍ରୋଜନ ବାତୀତ ପିତାର ସହିତ ଏଥନ ଆମାର ସାକ୍ଷାତ ହିତ ନା । ପୂର୍ବେ ତିନି ଆମାକେ କୁଲେର ପଡ଼ାର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିତେନ—କାଢେ ବସିଯା ଆମାର ଗାନ ଶୁଣିତେନ, ଏଥନ ଆର ତାହା ନାଇ । ବାବା ଯେଦିନ ବିମାତାକେ ଲାଇୟା ଥିଯେଟାରେ ଯାଇତେନ, ଆମାକେ ନିତେନ ନା, ସେ-ଦିନ ନନ୍ଦଦାଦାର ସଙ୍ଗେ ଆମି ବାଯକ୍ଷେପେ ଯାଇତାମ ।

কি কারণে জানি না, আমার পুরাতন গৃহ-শিক্ষককে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাবা আমাকে বলিলেন “তুমি এখন উপরের ক্লাসে পড়ছ, পুরাণে মাষ্টারের বিষ্ণু ত বেশী নয়; আজ কালকার স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত পরিচিত লোক না হলে চলেনা।” কয়েকদিন পরে আমার জন্য নৃতন' মাষ্টার আসিলেন। ইহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক।

প্রথম যেদিন তিনি পড়াইতে আসিলেন, সেইদিনই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ও পরিচ্ছদে আমি একটু আকৃষ্ট হইলাম। তাঁহার লম্বা লম্বা চুল কপাল হইতে উল্টা দিকে অঁচড়ান এবং ঘাড়ের কাঢ়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবড়ী পাকান—তাঁহার বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ—দাঁড়ী গেঁপ উঠে নাই—না পরিষ্কার কামানো তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কাপড় চিলা গালকোঁচা দিয়া পরিয়াচেন, মনে হয় যেন কাবুলীদের পা-জাম। গায়ে একটা পরিষ্কার ধৰ্ঘবে সাদা পাঞ্জাবী জামা—তখনও খদরের চলন হয় নাই। তাঁহার সূক্ষ্মাগ্র উন্নত নাসিকা—চোখ দুটী সুন্দর—কিন্তু একজোড়া সোণার ফ্রেমে বাঁধান চশমা সেই সৌন্দর্যকে অন্য রূপ দিয়াচে। পায়ে নকল জরীর কাজ করা নাগরা জুতা। তাঁহার বর্ণ উজ্জল শ্যাম—দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। তাঁহার কথায় যেন বাঁশী বাজে। তিনি সম্প্রতি বি, এ পাশ করিয়া কোন স্কুলে শিক্ষকের কার্য করিতেছেন। মাষ্টার মহাশয় অবিবাহিত।

তাঁহার নিকট আমার পড়াশুনা ভালভাবে হইতে লাগিল। তিনি গণিত শাস্ত্র বিশেষ জানিতেন না—তবে সাহিত্য, ইতিহাস বিশেষতঃ কাব্য তিনি অতি চমৎকার পড়াইতেন। সকালে বিকালে

দুইবেলাই তিনি আসিতেন । আমি চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম ।

নন্দদাদা আমার দুই ক্লাশ উপরে পড়িত । এবার তার এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার কথা । কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ না থাকায় সে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল । শুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীতেই রহিয়া গেল । নন্দ দাদা ও আমি একই মাস্টার মহাশয়ের নিকট পড়িতাম ।

দুই চারি দিনের পরিচয়ের পর একদিন মাস্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন “মানু, তুমি আমাকে ‘মাস্টার মশাই’ বলোনা— এ ডাকটা আমি ভারী অপচন্দ করি । আমাকে আমার নাম ধরে, ডাকতে পার ।” আমি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলাম— আপনি যেমন ‘মশাই’ কথাটা পচন্দ করেন না—আমিও তেমনি নামের শেষে ‘বাবু’ যোগ করা ভালবাসিনা । দেখেন নি—আজকাল ‘বাবু’ উঠে গিয়ে ‘শ্রীযুতের, প্রচলন হয়েছে ?’

মাস্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “তা বেশ, তুমি আমাকে “মুকুল দাদা” বলে ডাকতে পার । তুমি ত জান আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ।” এইরূপে মাস্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে লাগিল । আমি সেইদিন হইতে তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্মোধন করি ।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “খুকু, তোমার মাস্টার মহাশয়ের সকালে বিকালে চা খাওয়ার অভ্যাস আচ্ছে । ওর চায়ের বাবস্থাটা এখানেই করে’ দিও । তাহ’লে তিনি আরও একটু আগে আস্তে পারেন ।”

আমাদের বাড়ীতে দু'বেলাই চা তৈরী হইত। পূর্বে 'বাবা'র সঙ্গে বসিয়া চা খাওয়া আমার নিয়ম ছিল। আজকাল বাবা'র চায়ের পেয়ালা বিমাতা হাতে করিয়া নিতেন। বাবাও আমাকে কখন ডাকেন নাই; আমিও আর সেদিকে যাইতাম না। আমি মাস্টার মহাশয় আসিবার পূর্বেই আমার পড়িবার ঘরে একলা বসিয়া চা খাওয়া শেষ করিতাম।

এখন মাস্টার মহাশয় আমার চা পানের সঙ্গী হইলেন। সেই সময় আমাদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতিক নানা কথাবার্তা হইত। তখন দেশ-নেতাদের মহলে 'আত্মশক্তির' কথা উঠিয়াছে। মাস্টার মহাশয় বলিলেন “মানু, আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা সুখ দুঃখের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ‘সর্ববং আত্মবশং স্তুখং সর্ববং পরবশং দুঃখং।’ অন্বস্ত্র ত দূরের কথা, সামাজ্য বিষয়ের জন্যও আমাদিগকে পরের উপর নির্ভর করতে হয়। এই দেখনা কেন, চাকর চা তৈয়ারী করিয়া না দিলে আমাদের চা খাওয়া হয়না; অথচ ইহা দুই মিনিটের কাজ। আমাদের সমাজে ও পরিবারে বিলাসিতা এত বেড়ে উঠেছে।”

বাবাকে বলিয়া আমি একটী ছোট ইলেক্ট্ৰু ক হিটাম কিনিলাম। আমার পড়িবার ঘরে বিজ্লী বাতির থাগ ছিল। তাহার সাহায্যে আমি সহজে জল গরম করিবার বাবস্থা করিলাম। পরদিন মাস্টার মহাশয় আসিলে যখন স্বহস্তে চা তৈয়ারী করিয়া তাহার সমুখে পেয়ালা ও প্লেট ধরিলাম, তখন তিনি আনন্দে হাত বাড়াইয়া বলিলেন “বাং, উপযুক্ত ক্ষেত্ৰে পড়লে উপদেশের বীজ এমনি ফলপ্রদ বৃক্ষে পরিণত হয়।”

আমি তখন লক্ষ্য করি নাই, আমার ঐ সোনার চূড়া-পরা হাতখানির
ছায়া পেয়ালার মধ্যস্থিত তপ্ত তরল পদার্থে পড়িবার পূর্বে মাটা
মহাশয়ের হৃদয়ে অঙ্গিত হইয়াছিল।

পূজার সময় হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ। বাবা বিমাতাকে
লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন ভূত
ব্যতীত আর কেহ ছিলনা। আমার যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল।
কিন্তু মুখ ফুটিয়া বাবাকে কিছু বলিতে পারি নাই। কারণ,
আমাকে সঙ্গে নেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রায় নয়, তাহা আমি পূর্বেই
বুঝিয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। বিদেশে
যাইয়া পিতা অথবা বিমাতা কেহই আমার নিকট চিঠিপত্র লেখেন
নাই। পিসিমা আসিয়া বাড়ীতে ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে
হই একখানি চিঠি পাইতেন—আর টাকা পাঠাইবার জন্য সরকার
মহাশয়ের নিকট চিঠি আসিত।

একদিন নন্দ দাদা আমাকে বলিল “মানী, আজ মিনার্ডা থিয়ে-
টারে যাবে ?—চল—শিরীফরহাদ্ প্লে—খুব সুন্দর অপেরা।
একেবারে গন্ধুরন্ত নাচগান। সে একখানি বিজ্ঞাপন দেখাইল।
পিসিমার কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি বলিলেন “তোরা দু'জনই
চেলে মানুষ, মাটার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হয়।” বলা
বাহুল্য, মাটার মহাশয় আপত্তি করিলেন না।

আগরা তিনজনে একটা বক্স রিজার্ভ করিয়া বসিয়াছিলাম।
অভিনয় দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। বিশেষতঃ নৃত্যগীত আমাকে
অতিশয় প্রীত করিয়াছিল। মাটার মহাশয় প্রতিদৃশ্যের ঘটনাবলী
ও চরিত্র সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফরহাদের

অপূর্ব প্রেম ও শিরীর আত্মবিসর্জন আমার হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। আমি অনুভব করিলাম, আমার বুকের মধ্যে যেন কোন সুষুপ্ত পশুর ঘুম ভাঙিতেছে।

মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে ও সিনেমায় যাইতেন। তিনি না গেলে আমার আমোদ উপভোগ সম্পূর্ণ হইত না। কারণ তিনি সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতেন। যে দিন বিল্লমঙ্গল, শঙ্করাচার্যা কিন্তু ধর্মমূলক অভিনয় হইত, সে দিন পিসিমাও আমাদের সঙ্গে যাইতেন। ভক্তি ও ধর্মভাবের নাটকগুলি তাঁচার বড় প্রিয় ছিল।

আমার পিতা তখনও বিদেশে। আমি জুরে শ্বাসাগত। পিসিমা চিন্তাকুল। মাষ্টার মহাশয় দিবারাত্রি আমার শয়াপার্শে থাকিয়া আমার সেবা শুশ্রাব করিতেছেন। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, পথ্য তৈয়ারী, আমার কাছে বসা, প্রায় সমস্ত কাজ মাষ্টার মহাশয় করিতেন। তাঁহার স্কুল কামাই হইতে লাগিল। বেদনায় অস্থির হইলে তিনি আমার গা টিপিয়া দিতেন—মাথায় হাত বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতেন; আঙুর, বেদানা, নাসপাতি একটু একটু করিয়া আমার মুখে পুরিয়া দিতেন। পিসিমা ইহাতে একটু আশঙ্কা হইতেন।

যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমি যখন মা—মা বলিয়া কাঁদিতাম, তখন আমি লক্ষ্য করিয়াছি, মাষ্টার মহাশয় আমার সমবেদনায় চক্ষুর জল ফেলিয়াছেন। তিনি জানিতেন আমি মাতৃহীনা—পিতা অনাদৃতা কণ্ঠ। একমাস পরে একটু সুস্থ হইয়া আমি ক্ষীণকর্ণে বলিলাম “মুকুলদা, আপনিই আমাকে এবার বাঁচিয়েছেন।” মাষ্টার

মহাশয়^১ বলিলেন “মানু, ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।” আমি তাঁহার হাতখানি ধরিয়া আবেগে উচ্ছসিত কর্ণে বলিলাম—মুকুল-দা আপনার স্নেহের ঝণ আমি শোধ করতে পারব না।”

সেই হইতে অন্ত্যের অসাক্ষাতে মাষ্টার মহাশয়কে ‘তুমি’ সম্বোধন আবস্থ^২। আমাদের হৃদয় যেন পরম্পর অধিকতর নিকটবর্তী হইল। একদিন^৩ তিনি একখানি সুন্দর বাঁধান ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক আমার হাতে দিয়া বলিলেন “মানু, আমার ‘ঝরণা’ ঢাপা হয়েছে। তোমার সেবা করবার যে সুযোগ পেয়েছি, তাহাকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য আমার এই প্রথম গীতিকাব্য তোমারই নামে উৎসর্গ করেছি।” আমি ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুস্তকখানি লইয়া বলিলাম “মুকুলদা তুমি তোমার কবিতা ঢাপাতে দিয়েছ, এ কথাত আমাকে কখনো বলনি! মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন “এটী অপরাধ হয়েছে।”

আমাকে ইংরাজী সাহিত্য পড়াইবার সময় মাষ্টার মহাশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা সমূহ বাংলা পঞ্চে অনুবাদ করিয়া দিতেন। তিনি যে কবি ও ভাবুক তাহার পরিচয় পূর্বে পাইয়াছিলাম। ‘ঝরণা’ অনেক কবিতা আমার সম্মুখেই লেখা হইয়াছিল। আজ পুস্তক আকারে গ্রথিত হওয়াতে উহাব মধ্যে যেন নৃতন ভাব দেখিতে পাইলাম।

দিল্লী, আগ্ৰা, মথুৱা, বুন্দাবন, বোম্বাই, লাহোর, প্ৰয়াগ, কাশী, গয়া প্ৰভৃতি স্থান ভ্ৰমণ করিয়া বাবা পাঁচ মাস পৱে কলিকাতায় ফিরিলেন। হাইকোর্ট, খুলিবাৰ পৱেও দুইমাস তাঁহার কামাই হইল। ওকালতী ব্যবসা কৰিবাৰ আৱ তেমন ইচ্ছা তাঁহার

ছিলনা। এখন তিনি নিজের বিষয়—কর্ম দেখিতে অধিক যন্ত্র দিলেন।

আমার এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভাতা চাকুরীর ছেষ্টায় এক দিন আমাদের বাড়ীতে পিতার নিকট আসেন। তাহাকে আমি পূর্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে নিতান্ত পরিচিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন “কিরে মানু কেমন আছিস্—কোন্ ক্লাসে পড়িস্ ?” কে তোকে বাড়ীতে পড়াচ্ছে,” আমি বলিলাম—“এখন বেথুনে সেকেও ক্লাসে পড়্চি। মুকুল বাবু আমার প্রাইভেট টিউটার।”

তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন “ও—আমাদের ‘ঝরণা’ কবি মুকুল বাড়ুয়ো ?—সে যে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে স্কটিস্চার্চ কলেজে পড়েছি।” সন্ধা বেলায় মাস্টার মহাশয় আসিলেন, তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন “কি ভাই মুকুল, শুন্লুম তুমি মানুকে পড়াচ্ছ—বেশ। তারপর—কাব্য চর্চা ঢাঢ়া আর কি কাজ কর্ম হচ্ছে ?”

মাস্টার মহাশয় তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথা বাণ্ডা কহিলেন। আমাকে বলিলেন “রমেশ বাবু যে তোমাদের আগৌয়া একগাত মানু তুমি কখনও আমায় বলনি।” আমি বলিলাম, “আমিতি জানিতাম না। বাবা সেদিন এঁর পরিচয় দিলেন।” রমেশ দাদা বলিলেন “আমি প্রায় দশবৎসর পূর্বে একবার এবাড়ীতে এসেছিলাম। তখন মানদার বয়স ৩৪ বৎসর হবে। তখন আমি সবে মাত্র এণ্টুস দিয়েছি; স্বদেশী আন্দোলন আরও হ'ল, পড়াশুনা দেড়ে কয়েক বৎসর খুব হৈ চৈ করা গেল। তারপর

আঁবার কলেজে ভর্তি হলুম। গত বৎসর এম্ এ পাশ করে এতদিন বসে আছি।”

আমার পিতার চেষ্টায় রমেশ দাদার একটা ভাল চাকুরী হইল—কোন লিমিটেড কোম্পানীর অফিসের বড় বাবু, বেতন মাসিক দুইশত টাকা। তিনি প্রথম প্রায় একমাস আমাদের বাড়ীতেই রহিলেন। পরে কোন বোর্ডিংএ একটা ভাল কামরা ভাড়া করিয়া থাকিলেন। বাবার নিকট বলিলেন “হাতে কিছু টাকা জমাইয়া বাড়ী ভাড়া করিব—তখন মা, স্ত্রী ও ছেট ভাই বেনদের এখানে লইয়া আসিব।” সেই বৎসরই রমেশ দাদার বিবাহ হইয়াচ্ছিল।

পিসিমা চলিয়া গিয়াছেন। আমার মায়ের মৃত্যুর পর হইতে বামুন ঠাকুরই রান্না করিত। দুইটা ঝি ও তিনটা চাকর আমাদের বাড়ীতে ছিল। দেহ-স্থৰের নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিসের অভাব আমার হয় নাই। সুস্বাদু খাচ্ছ পানীয়—বিচিত্র বসন-ভূষণ প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। আমার পড়িবার ঘর ও শয়ন গৃহের সঙ্গা অতুলনীয়, আরামের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত। তথাপি আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটিত না। পিতার অনাদর, অবজ্ঞা এই ক্ষুধাকে নিত্য সতেজ রাখিত। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় যখন দেখিতাম কুলী-মজুরেরা তাহাদের ছেলেমেয়েকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, তখন আমি আমার সকল ঐশ্বর্যকে মনে মনে ধিক্কার দিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, দৈহিক অভাব মোচনই আদর নহে—অন্নবস্তু প্রদানই আদর নহে—আদর প্রাণের জিনিস—‘প্রাণকেই উহা স্পর্শ করে—ভাবেই উহার প্রকাশ।

আমার ত্রয়োদশ জন্মতিথির পূর্বব দিন বাবা আমাকে “ডাকিয়া
বলিলেন “খুকু, তোমার মাষ্টার মহাশয় ও রমেশদাকে নিমন্ত্রণ
করো।” জন্মদিনের উৎসব করিতে আমার আর ভাল লাগিত
না। তথাপি কোন প্রকারে দিনটা চলিয়া গেল। বিমাতা আমাকে
একছড়া সোণার হার উপহার দিলেন। রমেশ দাদার নিকট হইতে
একটা রূপার সুন্দর পাউডার কোটা উপহার আসিল। মাষ্টার
মহাশয় বোধ হয় দিয়াছিলেন একখনা রবীন্দ্রনাথের কাব্য।

আমি ছোটগল্প ও কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলাম। রমেশ দাদা
তাহা পড়িয়া খুব প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন “মুকুলকে
দিয়ে মাসিক কাগজে এগুলো ঢাপিয়ে দাও।—এ ত বেশ সুন্দর
হয়েচে। আজকাল মেয়েদের কি রাবিস্ লেখা বের হয়!”

আজকাল রমেশ দাদাও আমাদের সঙ্গে খিয়েটারে যাইতেন।
নন্দদাদা এখন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় মাতিয়াছিল, সে আর বড়
একটা যাইত না। বিশেষতঃ সে বেচারা নাটকের সাহিত্যের দিকটা
কিছুই বুঝিত না এবং অভিনয়ের মধ্যে যে আট’ আছে, তাহাও তার
উপলক্ষ্মি হইত না। ষ্টেজের উপরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নাচ-গান—সাজ-
পোষাক এসব জমকালো রকমের হইলেই সে খুসী হইত।

তখন গিয়েটারে একটা পরিবর্তন আসিতেছিল। শিক্ষিত
সম্প্রদায়ের ভদ্র যুবকেরা খিয়েটারে যোগ দিয়া তাহার মধ্যে
শিল্প-কলার বিকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। রমেশ-দা ও
মুমুল-দা এই অভিনব আটিষ্টদের মর্যাদা বুঝিতেন এবং তাহাদের
খুব প্রশংসা করিতেন। রমেশদার নিকট অনেক অভিনেতা,
অভিনেত্রীদের নাম ও পরিচয় আমি জানিলাম। এমন কি তাহাদের

তিতরৈর জীবন কাহিনীও তিনি আমাকে কিছু কিছু শুনাইলেন—
যাহা মুকুলদার ও অজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার দুই বৎসর পরে আমার পিতার
একটী পুত্র সন্তান হয়। ইতিমধ্যে তিনি ওকালতী ব্যবসায়
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বৈমাত্রেয় ভাইটীকে
আমি অতিশয় মেহ করিতাম; কিন্তু তাহার জন্য পৃথক আয়া ও
দাসী নিযুক্ত হওয়ায় আমি তাহাকে সর্ববদ্ধ কোলে নিতে পারিতাম
না। সন্তান প্রসবের পর বিমাতার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল।
বাবা তাহাকে লইয়া বিত্রত হইলেন। বড় বড় ডাক্তার-কবিরাজ
নিত্য আসিতে লাগিল। আট নয় মাস পরে বিমাতা একটু স্থস্থ
হইলেন বটে, কিন্তু শরীরের দুর্বলতা দূর হইল না।

আমার পিতার কোন কোন বক্ষ এবং আমার পিসিমা অনেকবার
বাবার নিকট আমার বিবাহের কথা উপস্থিতি করিয়াছিলেন, আমার
কাণে তাহা আসিয়াচে। বাবা বলিলেন এত অল্প বয়সে মেয়ের
বিয়ে দিব না। ম্যাট্রিক্স পাশ করুক। তার পর দেখা যাবে।”
পিসিমা ও পিতার বক্ষগণ ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সে সমস্ত
এখানে উল্লেখ নিষ্পত্তিযোজন। আজকাল খবরের কাগজে এ বিষয়ে
নানা বাদ প্রতিবাদ ও তর্কবিত্ক আপনারা পাঠ করিয়া থাকেন।

আমার যৌবনোন্তব হইয়াছিল। অভিভাবকের অসাবধানতায়
ও অনুকূল পর্বনে যথাসময়ে আমার হস্তয়ের মধ্যে প্রবৃত্তির অনল
জলিয়া উঠিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বিবাহের জন্য
মনে মনে আমার আকাঙ্ক্ষাও হইত।

তৃতীয়

পলাঞ্চন

বেথুনে পড়িবার সময় আমার তিনটী অন্তরঙ্গ বালিকা বক্স
লাভ ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে কমলার পরিচয় একটু বিশেষভাবে
দিব। কারণ তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন এক অচেহ্য
সম্বন্ধে জড়িত। বাল্যকালের কোন বন্ধুর সহিত এখন আর দেখা
হয় না। অনেককেই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু কমলাকে এখনও
ভুলিতে পারি নাই। সেও আমাকে হয়ত ভুলে নাই। আজ
এই আনুচরিত লিখিবার সময়ে তাহার কথা প্রতিমুহূর্তে আমার
মনে হয়—অতীত জীবনের স্মৃথি দৃঢ়ের কত কথা আজ মনে
হইতেছে।

কমলা পরমা সুন্দরী ছিল—ছিল কেন, এখনও বোধ হয় আছে।
নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে পুরুষেরা বলিয়া থাকে,—“স্ত্রীলোক কৃতি
পার হইলেই বুড়ি।” একথা সকলের সম্বন্ধে খাটেন। কৃড়ির
পর আরও কৃড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু এমন নারী হিন্দুসমাজে
ষাথেষ্ট আছে, যাহাদের সৌন্দর্য ভাদ্রের ভরানদীর মত ঢল ঢল,
শরতের জ্যোৎস্নার শ্যায় অনাবিল, তাহাতে মলিনতার লেশ মাত্র
নাই। আমি নিজে নারী হইয়া নারীর রূপে আকৃষ্ণ হইয়াছি,
শুনিয়া হয়ত আপনারা হাসিবেন।

শুধু রূপে নহে, গুণও কমলা আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার ভালবাসা ও সহানুভূতি আমি চিরদিন সমভাবে পাইয়াছি। আমোদ-প্রমোদে, গান-বাজনায়, হাস্য-পরিহাসে, খেলা-ধূলায়, লেখা-পড়ায় সকল বিষয়ে তাহার সমান অধিকার ছিল। স্কুলের প্রাইজ, ডিপ্লোবিউসন (পুরস্কার বিতরণ) অথবা অন্য কোন উৎসবের আয়োজনে কমলার সাহায্য না লইলে চলিত না। সে মেয়েদের গান ও অভিনয় শিখাইত।

একবার কোন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ চেষ্টায় ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিউটিউটে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। আমার রমেশ-দা তাহাতে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই উপলক্ষে বোধ হয় বেথুন, ডায়োসিসান, প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ঢাক্কীরা মিলিয়া নবীন সেনের ‘কুরুক্ষেত্র’ কাবা হইতে নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করে। তাহাতে আমি ‘শেলজার’ অংশ লইয়াছিলাম, কমলা নিজে ‘জরুৎকার’ সাজিয়াছিল। আমাদের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শেলজার দু'টী গান আমার মাষ্টার মহাশয় রচনা করিয়া দিয়া-ছিলেন। কমলা তাহাতে স্বর যোজনা করিয়া আমাকে শিখাইয়া-ছিল। অর্জুনের প্রেমলাভে নিরাশ শেলজার অন্তরের ব্যাথা সেই গানে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। সেই গান এখনও মাঝে মাঝে গাহিয়া আমি শান্তি পাই।

কমলা বৈদ্য বংশের মেয়ে। কলিকাতায় বাগবাজারে একখানা সাঁধারণ দোতালা বাড়ীতে সে তাহার মাতার সহিত বাস করিত। কমলার পিতা কার্য্যাপলক্ষে নানাস্থানে ঘৃড়িয়া বেড়াইতেন। মাঝে

মাঝে দুই এক মাস বা দশ পনরদিন কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন। কমলার একটী ছোট ভাই স্কুলে পড়িত। সে কমলার অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট ছিল।

বাড়ীখানা কমলাদের নিজের। সুতরাং তাহার পিতা মাসিক যে দুইশত টাকা পাইতেন, তাহাতে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ স্বচ্ছন্দে হইয়া যাইত।

আমি কমলাদের বাড়ী অনেকবার গিয়াছি। তাহার মাতা অতি শান্ত-স্বভাব ও স্নেহশীল। তিনি আমাকে আদরের সহিত কত সুমিষ্ট খাদ্য আহার করাইতেন। আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিলাম বলিয়া সহজেই কমলার মাঘের বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িলাম। তিনি সর্বদাই আমাকে বলিতেন “তুমি আমার কমলার ছেটবোন।” কমলা বয়সে আমার দুই বৎসরের বড় ছিল।

কাশীতে কমলার পিতার এক বন্ধু বাস করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় এক যুবকের সহিত কমলার বিবাহ হয়। উহা দুই বৎসর পূর্বের কথা। কমলা তখন আমদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। যুবকটী কাশীতেই চাকুরী করিত—তাহার পিতামাতাও সেখানে থাকিতেন। গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটিতে কমলা কাশীতে স্বামীর কাছে যাইত। কমলা ও তাহার স্বামীর মধ্যে যে সকল চিঠীপত্র চলিয়াছে, তাহা সমস্তই আমি দেখিয়াছি। আমরা দুইজনে গোপনে বসিয়া তাহাদের কত অর্থ বিশ্লেষণ করিতাম।

আমাদের সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে এই সব চিঠি লইয়া কত হাস্ত পরিহাস চলিত। আমার আরও দুই তিনটী বিবাহিতা বন্ধু-ছিলেন। তাহাদের স্বামী-প্রেমের ভিতরের রহস্যও আমি

জানিতাম। প্রথম প্রণয়-সন্তাষণ, বাসর রজনী ধাপন, মান-অভিমানের অভিনয়, পুরুষের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় লইয়া আমাদের মেয়ে মহলে নিত্য আলোচনা হইত। এই সকলের মধ্যে আমি আমার ছোটু গল্লের প্লট ও কবিতার উপাদান পাইতাম। তাই মুকুলদা আমাকে বলিতেন “মানু, তোমার গল্লে ও কবিতায় আমি রিয়ালিষ্টিক আর্টের গন্ধ পাচ্ছি।”

প্রায় আট নয় মাস হইল, কমলার সহিত তাহার স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটিয়ায়াছে। ইহার কারণ বড় ভয়ানক। কমলার শশুর কিরূপে শুনিয়াছেন, কমলার মাতা কমলার পিতার বিবাহিতা পত্নী নহে—রক্ষিতা মাত্র। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া পতিতা নারীর কণ্ঠাকে তিনি পুত্রবধূ রূপে গৃহে রাখিতে পারেন না। তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন—কমলাকে আর তিনি গ্রহণ করিবেন না।—পুত্রের পুনর্বার বিবাহ দিবেন। তিনি আরও ভয় দেখাইয়াছেন, যদি কমলা তরণ-পোষণের দাবী করে, তবে আদালতে তিনি সমস্ত কলঙ্কের কগা প্রকাশ করিয়া দিবেন, এবং প্রতারণার অভিযোগ করিয়া কমলার পিতার বিরুদ্ধে পাল্টা মোকদ্দমা আনিবেন।

এই ব্যাপার উপলক্ষে কমলার স্বামী যে কয়েকখানা পত্র তাহার নিকট লিখিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। তিনি কমলাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কমলাও তাহার স্বামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কে যেন দারুণ খড়গাঘাতে ইহাদের প্রেমের বন্ধন ঢুঁম করিয়া দিল। কমলার স্বামী লিখিয়াছেন—“কি করুব—তোমার কোন অপরাধ নেই জানি কিন্তু আমি পিতার অবাধ্য হ'তে পারি নে। আমায় ক্ষমা কর কমল। ধর্মসাক্ষী করে

তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম—আবার ধর্মের মুখ চেয়েই তোমায় পরিত্যাগ করছি। অগ্নি পরীক্ষার পরও রামচন্দ্র কলঙ্কিত পত্নীকে নিয়ে গৃহধর্ম পালন করতে পারেন নি। সীতার মত পত্নীকে বিসর্জন করতে হয়েছিল। এখন বিদায়, আমার ভালবাসা তুমি চিরদিন পাবে—কিন্তু পত্নীরূপে নহে।”

এই পত্রের উত্তর আমিই কমলাকে লিখিয়া দিয়াছিলাম। পত্রের উত্তর দিবার কমলার ইচ্ছা ছিল না। তার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বাহিরের আমোদ প্রমোদে সে তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিত কিন্তু আমি তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যান্ত দেখিতাম। আমার অনুরোধে ও উপদেশে কমলা শেষে এইরূপ লিখিল—“তুমি যাহা সিদ্ধান্ত করেছ, তাহা অটল থাকুক। তোমার পিতৃভক্তি যেন বিচলিত না হয়। তুমি ভারতের আদর্শ গৌরব দেখিয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছ, তাহার শেষ চির তোমার চোখে পড়েনি। পরশুরামের প্রায়শিত্ব—ভীমের শরণযা—রামচন্দ্রের বিলাপ তুমি ভুলে গিয়েছ। পিতৃভক্তি মাতৃঘাতী কুঠার হস্ত-মুক্ত করবার জন্য পরশুরামকে দীর্ঘকাল তীর্থ ভ্রমণ করতে হয়েছিল, পিতৃভক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে নি। প্রেমে প্রত্যাখ্যাতা অম্বার তপস্তা ভীমের ক্ষাত্রিণিকে নপুংসকের হস্তে পরাভূত করেছিল, পিতৃভক্তি তাহাকে রক্ষা করতে পারে নি। এ জগতে প্রত্যেক কর্মের ফল পৃথক পৃথক ও স্বাধীন।”

“একের দ্বারা অন্যের প্রতিরোধ হয় না। তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য নহে। প্রগল্ভতা ক্ষমা করো। তুমি মহৎ—তাই আমার পরিত্যাগ করেও চিরদিন

ভালভাস্বৈবে বলছ, কিন্তু আমি তোমার মত মহৎ নই—
আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—স্বোতে ভাসিয়া চলিলাম, জানিনা
কোথায়।”

কমলার এই পত্রেরও উত্তর আসিয়াছিল। তাহাতে তাহার
স্বামী লিখিয়াছিলেন “কমল আমার অপরাধ বুঝেছি। প্রায়শিত্তের
দিন এলে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করব। তখন যেখানেই থাক
হতভাগ্যকে একবার মনে করো।” বুঝিলাম কমলার স্বামীর প্রাণ
আচ্ছে। সে যথার্থ :দরদী, কিন্তু অবস্থার দাস। সমাজের
ক্রত্রিমতার আধাতে এমন কত হৃদয় স্বভাবের পথে পরিচালিত
হইতে পারে না। সমাজ-বিধি এমনি করিয়া মানব জীবনের
পরিস্ফুল্লিতির পথে অন্তরায় হয়।

কমলার মায়ের সন্ধিক্ষে যে কলঙ্কের কথা রচিয়াছিল, তাহা
কতদূর সত্য আমি তাহার অনুসন্ধান করি নাই। পদ্মফুলের মূল
থাকে কাদায়—সূর্য তাহার খোঁজ রাখে না। সে জলের
উপরে ফুলটীকে ফুটাইয়া স্থুলী হয়—বাতাস তাহাকে দোলায়—
অমর তার মধুপান করে।

কমলা আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিত। আমার পিতা ও
তাহাকে স্নেহ করিতেন। মাট্টার মহাশয়, আমি, কমলা ও রমেশ
দাদা মাঝে মাঝে মোটরে বেড়াইতে যাইতাম। কমলাদের বাড়ীতে
আমাদের চা-পার্টির নিমন্ত্রণ হইত। কমলার মাতা ধনীর গৃহিণী
না হইলেও আমাদের আদর যত্নের ক্রটী হইত না। তিনি স্বহস্তে
সমস্ত খবার প্রস্তুত করিতেন।

আমি যে সকলের সঙ্গে একুশ অবাধ মেলা মেশা করিতাম,

ইহাতে পিতার কোন আপত্তি ছিলনা। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি সামাজিক ব্যাপারে উদার মত পোষণ করিতেন। আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে খানিকটা মাঠের মত জায়গা ছিল। আমি বাবাকে বলিয়া সেখানে একটী টেনিস-কোর্ট তৈয়ারী করাইলাম। নন্দ-দাদা এ-বিষয়ে বিশেষ উৎসোগী হইল। রমেশ-দা' মুকুল-দা, কমলা, আমি, নন্দলাল এবং আরও কয়েক জন বন্ধু বৈকালে এই মাঠে টেনিস খেলিতাম। মুকুল-দা খেলা কিছুই জানিতেন না—তাহাকে অনেক ধরিয়া বাঁধিয়া শিখাইয়া লইলাম। কমলা খেলায় খুব নিপুণ ছিল। সে সর্ববদ্ধাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিত। রমেশ-দা ও মুকুল-দা কখনও আমার পক্ষে কখনও কমলার পক্ষে খেলা করিত।

বিমাতা আমাদের সংসারে আসিবার সময় পিত্রালয় হইতে একটী দাসী আনিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল হরিমতি। তাহাকে বিয়ের কাজকর্ম কিছুই করিতে হইত না। সে ছিল অনেকটা আমার বিগাতার পাস্ত্যাল এসিষ্টাণ্ট বা প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাহার বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ হইবে। বোধ হয়, সে বিধবা—গান কাপড় পড়িত, হাতে নোয়া ও সিঁথিতে সিন্দুর দিত না, তাহার গলায় একচুড়া সরু বিছাহার ও হাতে চারিগাঢ়ি সোণার চুড়ি ছিল। সে একাদশীর উপবাস করিত, মাঘায় গন্ধ তেল মাখিত ও চবিবশ ঘণ্টা দোক্লা দেওয়া পান চিবাইত। চাকর বেচানেদের উপর যে তা'র কটাক্ষপাত না হইত এমন নহে।

বাড়ীর এক নিভৃত কোণে হরিমতি তার শোবার ঘর টিক করিয়াছিল। উহা সে প্রয়োজন মত সাবধানে তালাচাবি দিয়া বন্ধ কয়িয়া রাখিত। দুপুর বেলা সে এ ঘরে যাইয়া যুমাইত। তার

নিজের কোন নির্দিষ্ট কাজ না থাকায় অপর সকলের কাজের উপর
ওস্তাদি করিয়া বেড়াইত—আর খামাকা কথা তুলিয়া কেবলি
গোলযোগ পাকাইত ।

আমার এই রকম চাল-চলন হরিমতি দুই চক্ষে দেখিতে পুরিত
না । সে প্রথমে বিমাতার নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ
করিল । কিন্তু বিমাতা আমার প্রায় সম-বয়সী, বিশেষতঃ মায়ের
মত গান্তীর্য ও শাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না । তিনি
রুক্ষভাষণী ও কোপন স্বত্বাব নহেন । স্তুতরাং তিনি আমায়
কিছুই বলিলেন না । বিফল মনোরথ হইয়া হরিমতি বাবার কাছে
গেল ; কিন্তু সেখানেও কোন স্বিধা হইল না ।

অবশ্যে সে নিজেই আমাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিল ।
একদিন হরিমতি আমাকে বলিল “আচ্ছা, খুকুমণি এসব কি বলত !
পাড়াময় লোকে ছিছি কচ্ছে । জ্ঞাতি ভাই আছে—মাস্টার
আছে, বেশ তাদের সঙ্গে সভা ভব্য হয়ে কথা কও—হাস্তে হাস্তে
পুরুষের গায়ে ঢলে পড়া—গলাগলি হ'য়ে বেড়ান ! তুমি সোমন্ত
মেয়ে—বিয়ে হ'লে এদিনে ছেলের মা হ'তে ।”

হরিমতি যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়, এজন্য আমি কোন
উত্তর দিলাম না । মাথা নীচু করিয়া রহিলাম । ৰগড়া করা
আমার স্বত্বাব নহে । বিশেষতঃ এক্ষেত্রে বাদ প্রতিবাদ আমার
পক্ষে স্ববিধাজনক হইবে না, তাহা আমি জানিতাম । ঘটনা যে
পাড়াময় ছড়াইয়াছে, একথা হরিমতি আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য
বলিয়াছিল । তবে ইহাও আমি জানিতাম, যদি আমার কখনও
‘বদ্নাম’ রাটে, তবে তাহা হরিমতি দ্বারাই হইবে ।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ধারণা সত্ত্বে পরিণত হইল। 'হলি-
মতি যখন দেখিল মুখের কথায় শাসাইয়া আমাকে জন্ম করিতে
পারিল না, তখন সে পাড়াময় আমার বদনাম রটাইতে লাগিল।
কথা ক্রমশঃ বাবার কাণে উঠিল, তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি
সংবাদ-দাতাকে বলিলেন, “আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাধীনতাবে
চলাফেরা করিলে অমনি সাধারণ লোক নানা মিথ্যা কলঙ্কের
কথা রটায়। কারণ—এদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা চলিত নহে।”

আমার জেন বাড়িয়া উঠিল। মুকুল দাদা আমাকে একদিন
কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “প্রেমের পথে যতই বাধা বিঘ্ন আসে,
ততই উহা প্রবল হয়।” ইহার প্রমাণ আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে
পাইতে লাগিলাম।

আমার প্রথম যৌবনের উদ্বাম আকাঞ্চা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া
উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে দেখিলাম দুইটী যুবক—মুকুল ও
রমেশ। প্রকৃতির নিয়মে ইহাদের দিকে প্রবৃত্তির প্রবাহ প্রবল
বেগে ছুটিল। আমাকে টানিয়া রাখিবার জন্য শাসন, মাতৃস্নেহ,
আদর-যত্ন ছিল না। আজ মনে হয়, আমার মা বাঁচিয়া থাকিলে
হয়ত এ-পথে আসিতাম না। আমার বাবা যদি একদিনও একটু
আদর করে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেন, অথবা শাসন
করিতেন তবে বোধ হয় এ জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত।

মুকুলদা একটু ভীরু স্বভাব। রমেশ-দা ছিল সাহসী ও
বেপরোয়া। একদিন দুপুর বেলা বাবা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া
পড়িতেছিলেন। আমাদের দুল ছুটি। আফিসও বন্ধ। রমেশ-দা
আসিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কাকাবাবু, মানী কোথায় ?”

বাবা বলিলেন উপরে আছে—কেন ?” রমেশদা বলিলেন “আজ আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, মানী যদি যায়, তবে কাকীমাকে শুন্দি নিয়ে যাব।” বাবা বলিলেন “যাও জিঞ্জেস্ করে এস।”

রমেশ-দা একবারে আমার শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি অর্ধ শয়ান অবস্থায় গীতগোবিন্দের একটা কবিতা পড়িতেছিলাম। তিনি পালঙ্কের উপরে আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মানী আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবে ? —চল।” আমি বলিলাম, “না রমেশদা, আজ শরীরটা ভাল নয়।” রমেশদা আমার কপালে হাত দিয়া কহিলেন “কৈ, কিছুইত নয় ! দেখি হাত !” তিনি আমার বাম হাত খানি টানিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন “কিছুনা—তোমার সব চালাকী ! তিনি আমার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার আঙুলগুলি প্রবেশ করাইয়া পাঞ্জা ধরার মত আমার হাত টিপিতে লাগিলেন। আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত এক অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হইতেছিল।

আমি কাত হইয়া ফিরিয়া শুইলাম। একটু মুচ্কি হাসিয়া বলিলাম, “নাড়ী টিপিয়া আর কপালে হাত দিয়াই বুঝি সব ব্যারাম ধরা যায়।” রমেশ-দা এই পরিহাসের অর্থ বুঝিয়া বলিলেন “তবে আমাকে বিনা ষ্টেগিস্কোপেই পরীক্ষা করতে হয়।”

* * * *

কিছুক্ষণ পরে রমেশ-দা বাহির হইয়া গেলেন। হিংস্র ব্যাস্ত যেমন রক্তের স্বাদে উন্মত্ত হয়, আমিও তেমনি হইলাম।

আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা অনুত্তাপ আসিল না। বরং আশঙ্কা ও সক্ষেচ কাটিয়া গেল। বুঝিলাম ইচ্ছা থাকিলে স্বয়েগের অভাব হয় না।

চতুর্থ সাত মাস চলিয়া যায়। আমি প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন দিতেছি। রমেশ-দা তখনও বোর্ডিং-এ থাকেন। নানা অঙ্গে দেখাইয়া পরিবার আনেন নাই। মুকুলদা কমলার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্ক মতে কমলাকে বিবাহ করিতে সন্মত, এইরপ ভাবও দেখাইয়াছেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। কমলা কিন্তু তখনও দূরে দূরে—সে তার পূর্বের স্বামীকে এত শীঘ্র ভুলিতে পারে নাই।

একদিন রমেশ-দা আমার নিকট প্রস্তাব করিল, আর ত এ বাড়ীতে হ'তে পারে না। এমন স্থানে চল, যেখানে নিত্য তোমায় দেখ্ব—প্রতিমুহূর্তে তোমায় প্রাণের কাছে রাখতে পারব। পাগরের পাহাড় চুরমার করে যখন নদীপ্রবাহ একবার বেরিয়েছে, তখন চল একবারে মুক্তপ্রাণের যেয়ে পড়ি। আমি কোন উত্তর না দিয়া রমেশ-দার গলা জড়াইয়া তাঁর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্তী হইয়াছিল। . বাড়ীতে সকালবেলা অধিকক্ষণ পড়িবার জন্য আমি বানাকে বলিয়াছিলাম যে এখন স্কুলের গাড়ী প্রগম ট্রিপেই নয়টার সময় আমাকে নিতে আসে; অগচ ক্লাস বসে সাড়ে দশটায়। বল্কি সময় আমার বুথা নষ্ট হয়। বাবা বলিলেন, “বাড়ীর মেটরত মেরামত করতে দেওয়া হয়েছে। যতদিন না আসে ততদিন ট্যাক্সি করে যেও।

আমার একটু পরে গেলেও ক্ষতি নাই!” এমনি করিয়াই
অপ্রত্যাশিত স্বযোগ আসিয়া জোটে। আমি ভাবিতেছিলাম
নন্দদাকে কি বলিয়া আগে নামাইবার ব্যবস্থা করি। সাধুর
সৎকার্যের বুদ্ধি যিনি প্রেরণ করেন, চোরের মাথায় ফিকির ফন্দিও
তিনিই ঘোগান।

নন্দ-দাকে তাহার স্কুলে নামাইয়া দিয়া আমি একেবারে সোজা-
সুজি রমেশদার বাসায় উপস্থিত। দেখিলাম সেখানে মুকুল-দাও
রয়েছেন। রমেশ-দা একটা স্টুকেশ লইয়া আমার সহিত অন্য এক
ট্যাঙ্কিতে উঠিলেন। মুকুল-দার নিকট এইখানেই বিদায় নিলাম।
তাড়াতাড়িতে কমলাকে কিছুই জানান হয় নাই। মুকুল-দাকে
বলিলাম, তিনি যেন কমলাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলেন।
ট্যাঙ্কী হাওড়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। পশ্চাতে চাহিয়া
দেখিলাম, মুকুল-দা রুমালে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্বে একবার মনে হইয়াছিল,
যাইবার সময় মায়ের ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া যাইব। কিন্তু
মানসিক উদ্বেগে সে কথা ভুলিয়া গেলাম। ভালই হইয়াচ্ছে
বলিতে হইবে, কারণ মায়ের ছবির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বোধ হয়,
এতবড় জগন্ত দুঃসাহসের কার্য করিতে পারিতাম না।

আমরা একটা লোক্যাল ট্রেণে বর্দমান যাইয়া কিছুক্ষণ
থামিলাম। তার পর সন্ধ্যায় লাহোর এক্সপ্রেসে একেবারে দিল্লী
অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

চতুর্থ

কুল তাঙ্কল

আমি ঘর ছাড়িলাম কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্ট-
ভাবেই দিব। প্রবৃত্তির উদ্ভেজনায় মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য
হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। শরীর-ধর্মের স্বাভাবিক
নিয়ম অনুসারে যে বয়সে আমাদের ঘোবন চাঙ্কল্য দেখা দেয়,
তখন বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা সমাজে
আছে। বালক বালিকাদিগকে স্কুলিক্ষায় নিরত এবং সর্ববিদা
সৎসঙ্গে রাখিলে এই ঘোবন চাঙ্কল্য অল্প বয়সে আসিতে পারে
না। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ে স্কুলিক্ষা ও সৎসঙ্গেরই
অভাব। তাহার ফলে তরুণ হৃদয়ে অকালে ঘোবন সম্মেলনের
উদ্ধার কামনা জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমি স্কুলিক্ষা ও সৎসঙ্গ কিছুই পাই নাই। স্কুলে শিক্ষার
ফলে কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস প্রভৃতি তরল সাহিত্যই
পড়িতে শিখিয়াছি। তাহাতে আমার হৃদয়ে কল্পনার উদ্ভেজনায়
দুস্প্রবৃত্তি সকলের আগে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। সদ্গ্রহে
কথনও পড়ি নাই—যাহাতে সংযম শিক্ষা হয়, যাহাতে ধর্মভাবের
উদয় হয় এমন কোন পুস্তক কেহ আমার হাতে দেয় নাই।
আমোদ প্রমোদ যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহা সমস্তই অতি নিম্ন
স্তরের। থিয়েটারে নাচ গান, সিনেমার চিত্র কথনও হৃদয়ে সন্দৰ্ভ

জাগ্রত করে নাই। অল্প বয়স্কদের পক্ষে তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা বিপদ্জনক। দুই একটা দাঁত উঠিলেই যদি শিশুকে মাছ খাইতে দেওয়া যায়, তবে সে যেমন গলায় কাঁটা বিঁধিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় ; থিয়েটার দেখায় ও নভেল পাঠেও দেশের তরুণ তরুণীদের সেই মরণদশা ঘটিতেছে। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই কথা বলিতেছি। আমার মত যাহারা আছে তাহারাও ইহার সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াই আমার মনে হইয়া-ছিল আমি খুব জানি। তরুণ সাহিত্যিকদের গল্প উপন্যাস যথেষ্ট পড়িয়াছিলাম ; বিশেষতঃ মুকুলদার অনুগ্রহে সেলী, বায়রণ, সেক্সপীয়ার, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ, ঈশ্বরচন্দ, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তক ও কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। স্মৃতরাং অহঙ্কার যে আমাকে ফুলাইয়া তুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি !

যাহারা কেবল কল্পনাময় রাজ্যে বিচরণ করে, সংসারের কঠোর সত্য সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান জন্মে না। কবি ও সাহিত্যিকেরা এই রকম ধরণের লোক। তাঁহারা শুধু চিন্তা লইয়া খেলা করেন, কর্মের ধারেও ঘোঁসেন না। মুকুলদার শিক্ষায় আমার এই দশা হইয়াছিল। কাব্য কবিতা ও নাটক নভেলের মধ্য দিয়া সংসারকে কল্পনার চক্ষে যেমন দেখিয়াছি, প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলাম সে সমস্তই মিথ্যা।

আমি যখন গৃহত্যাগ করি তখন আমার বয়স পনর বৎসর। এই বয়সে যদি আমি আমাকে নিঃসহায় ও বুদ্ধিহীন মনে করিতাম,

যদি ভাবিতাম যে আমি ত সংসারের কিছুই জানিনা—যদি আমার
পদে পদে ভয় হইত, তবে আমি কখনই এমনভাবে বাহির হইতাম
না। কিন্তু একটা মিথ্যা গবর্ব আমাকে দুঃসাহসী ও দুরদৃষ্টিহীন
করিয়া তুলিল। আজ মনে হয়, আমি যদি উপযুক্ত অভিভাবকের
অধীন থাকিতাম, তবে আমার ভাল হইত। স্বাধীনতার মধ্যেও যে
পরাধীনতার প্রয়োজন আছে, তাহা এখন বুঝিয়াছি।

ভাবিয়াছিলাম, ঘরের বাহির হইলেই বুঝি সকল বাধা দূর হইয়া
যাইবে—প্রবৃত্তির ভোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায় চালাইতে পারিব।
কিন্তু দিল্লীতে পেঁচিয়া দেখিলাম, ব্যাপার বড় গুরুতর। পুলিশের
ভয়—আমাদিগকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। বিদেশে, লোকজন
সমষ্টই অচেনা। আমরা বাঙালী, কোথায় যাই কোথায় থাকি, কি
থাই। রমেশ-দা বাহিরে গেলে আমি একাকী কিরূপে ঘরে থাকিব!
নানারকম সমস্তা—বহুপ্রকারের অস্তুবিধি। বাড়ীতে যে ইহা
অপেক্ষা ছিল। ভাল সেখানেত আরও স্বাধীন ছিলাম—এমন কি
রমেশ-দার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের স্বয়েগও ছিল বেশী।

অবশ্য টাকার জোরে সকল অস্তুবিধাই অতিক্রম করা যায়।
কিন্তু রমেশদার কি এত টাকা আছে। আমি ত প্রায় এক বক্সে
বাহির হইয়া আসিয়াছি। রমেশ-দা আড়াই হাজার টাকা সঙ্গে
আনিয়াছেন। বসিয়া বসিয়া থাইলে ইহাতে কতদিন চলিবে? পশ্চিম
ভারতের যে কোন সহরেই থাকি, খুব উঁচু ষ্টাইলে ভাল হোটেলে
থাকিতে হইবে। আমার কাপড় চোপড় ও কিছু গহনাপত্র চাই।
একটা ছোক্রা চাকরের দরকার। আমরা শাকভাত, ডালরুটি
থাইয়া সম্ম্যাসীর মত গাছ তলায় থাকিতে নিশ্চয়ই আসি নাই।

শিক্ষিতা পতিতার আঞ্চলিক

আমাদের জীবন ভোগের পূজা, তাহার প্রধান উপকরণ
কাঞ্চন।

দিল্লীতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল ; মুকুলদার পত্রে জানিলাম
বাবা আমার জন্য খুব অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু পুলিশে
এজেহার দেন নাই। রমেশ-দার উপর ঘোরতর সন্দেহ হইয়াছে।
তাঁহার আফিসে ও বাড়ীতে খবর লওয়া হইতেছে। কমলা অতিশয়
দুঃখিত। দিল্লী হইতে লাহোরে গেলাম।

রমেশ-দা পূরা এক বৎসরও চাকুরী করেন নাই। এরই মধ্যে
তিনি কিরূপে চারিমাসের ছুটী পাইলেন, একথা কথনও আমার
মনে হয় নাই।

কতদিন কাজ করিলে কতদিন ছুটী মিলে—কোন্ আফিসের
ক রকম দস্তুর, ইহার খোঁজ খবর কাব্য উপন্থ্যাসে পাওয়া যায় না।
আমি ভাবিয়াছিলাম আফিসের কেরাণীরা চাহিলেই ছুটী পায়।

আমরা রেলপথে সেকেশন ক্লাসে ভ্রমণ করি। বর্দ্ধমানে
গাড়ীতে উঠিয়া রমেশ-দা স্টেকেস্ খুলিলেন। আমার সম্মুখে পাঁচ
তাড়া মোট রাখিয়া বলিলেন “মানু, এই আমাদের সম্বল”। আমি
গুণিয়া দেখিলাম প্রত্যেক তাড়ায় ১০০ খানি পাঁচ টাকার মোট।
এই আড়াই হাজার টাকা রমেশ-দা কোথায় পাইলেন তখন ভাবি
নাই। মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে এক বৎসরের বেতনও আড়াই
হাজার হয় না। রমেশ-দা বোধ হয় বড়লোকের ছেলে—বাপের
টাকা উড়াইতেছেন। তাওত নয়। আমার পিতার কাছে রমেশ দা
চাকুরী প্রার্থী হইয়াছিলেন। অর্থাবে মাসাবধি তিনি আমাদের
গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভুল ভাঙ্গিল

এত কথা তখন আমার মনে আসে নাই। কারণ ভোগলালসা
বা'র স্থষ্টি, সেই সয়তান সমস্ত ভুলাইয়া রাখে। স্থখের স্বপ্নে
বিভোর গন্ধর্ব দম্পত্তী অথবা কিন্নর মিথুনের মত আকাশের মধ্য
দিয়া চলিয়াছি—মাটীতে আর পা পড়িতেছে না।

লাহোর হইতে আমরা অনৃতসরে যাই। সেখানে তিনদিন
গাকিয়া কাশ্মীর যাত্রা করি। শ্রীনগরে আমরা প্রায় একমাস
থাকি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতিশয় মনোরম তাহা
সকলেই জানেন। আমাদের নৃতন প্রেমের বন্যা এখানে খুব
উচ্ছলিয়া উঠিল।

বোঝাই আসিলাম। আমার ভয় ক্রমশঃ কাটিয়া গেল।
প্রথমে যে সকল বিপদের সন্তান দেখিয়াছিল, এখন তাহা দূর
হইল! পুলিশের ভয় নাই। রমেশ-দা খুব চতুর ও ছসিয়ার
লোক। যদিও মুকুলদার চিঠিতে জানিয়াছিলাম, বাবা পুলিশে
এজেহার দেন নাই, তথাপি তিনি ষেখানেই যাইতেন, সেইখানে
প্রথম থানার পুলিশ কর্মচারীদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন।
গ্রেপ্তারী পরওয়ানার কোন গন্ধ পাইলে সময় থাকিতে সরিয়া
পড়িবেন, এই তাঁহার মতলব ছিল।

ক্ষুলে, নীচের ক্লাসে পড়িতেই আমি ইংরাজীতে বেশ কথা
কহিতে পারিতাম। মুকুলদার শিক্ষায় ও রমেশ-দার সঙ্গে থাকিয়া
এই বিষয়ে আমার আরও উন্নতি হইয়াছিল।

হোটেলে আমরা সাহেবী ষ্টাইলে থাকিতাম। আমি পার্শ্ব
মেঘেদের ধরণে কাপড় পড়িতাম। সকলের সঙ্গে মেলামেশা
করিতে আমার ইংরাজী কথা বিশেষ সহায় হইয়াছিল। বিদেশের

খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন আমি অঙ্গ সময়ের মধ্যেই শিখিয়া
লইলাম। প্রথম প্রথম আমি এসব লইয়া অত্যন্ত বিক্রিত হইয়া
পড়িয়াছিলাম। রমেশ-দা আমাকে বলেন “হাঁরে মানু, তোরা
বাংলা দেশের মেয়ে যদি পঞ্জাবে এসে মনে করিসু, ওরে বাবা—এ
কোথায় এলাম—বোম্বাইয়ের লোক যদি বাংলায় মেয়ে খাওয়া
দাওয়া চলাফেরা নিয়ে মুক্ষিলে পরে, মাজাজীরা যদি অযোধ্যাকে
ভাবে বিদেশ, তবে বল্ল দেখি সমগ্র ভারতে জাতীয়তা গড়ে উঠবে
কি করে ?”

আমি বলিলাম, “ভারতবর্ষ এক বৃহৎ দেশ, এর মধ্যে ভাষার,
ধর্মের, সামাজিক রীতিনীতির এত বৈচিত্র, ও বৈষম্য যে এখানে
একজাতি গড়ে উঠা অসম্ভব মনে হয়।” রমেশ-দা জোরের সহিত
বলেন “এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।” রমেশদার এই
একটা গুণ দেখিয়াছি, তিনি যেখানেই গিয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত
পরিচিত স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন—শুধু চিন্তায় নহে,
কার্য্যেও।

দিল্লী, লাহোর, শ্রীনগর, বোম্বাই এই সকল সহরে থাকিবার সময়
ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও তীর্থস্থান সমূহ দর্শন করিয়াছিলাম। ইহাতে
আমার মানসিক বিকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। চঞ্চলতার
পরিবর্তে হয়যে শান্তভাব আসিল। বিমর্শতার স্ত৲ে আনন্দের
ওভজ্বল্য দেখা দিল ; রমেশদা একটা স্বস্তির নিশাস ফেলিলেন।

শ্রীনগর হইতে বোম্বাই যাইবার পথে আমরা দ্বারকা ও
রাজপুতনা হইয়া গিয়াছিলাম। পুকুর, ভরতপুর, জয়পুর, চিতোর
প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রাণে এক অপূর্ব প্রশান্ত ভাবের

উদয় হইল। আমি বাড়ীর কথা, বাবার কথা, সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। একবার বাবার সঙ্গে এদিকে বেড়াইতে আসিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বিমাতার পক্ষপাতী হইয়া আমাকে লইয়া আসেন নাই। আজ রমেশদার অনুগ্রহে আমার সেই সাধ পূর্ণ হইল। আমি ইঁটিবার সময় রমেশদার হাত ধরিয়া চলিতাম—মোটরে চড়িয়া যাইবার সময় রমেশদার গলা জড়াইয়া বসিতাম। পশ্চিম ভারতের সেই উঁচু নৌচু রাস্তায় মোটরে চলিবার সময় স্পীং-এর মৃদু দোলায় নাচিয়া নাচিয়া আমাদের পরস্পর আনন্দিত বক্ষে কি পুলকের তরঙ্গ উঠিত! রমেশদার প্রতি শুধু প্রেমে নহে—কৃতজ্ঞতায়ও আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

হলদিঘাট দেখাইয়া রমেশ-দা বলিলেন “এই আমাদের ভারতের থার্মোপলি—যেখানে পনর হাজার রাজপুত দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। এ বীরত্ব গৌরব আজ আমরা ভুলে গেছি। রমেশদা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িলেন। আমি ডি, এল, রায়ের রাণা-প্রতাপ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম “এমন কঠোর ব্রত—এমন তীব্র বৈরাগ্য—স্বদেশের দাসত্ব মোচনের জন্য এমন অপূর্ব স্বার্থত্যাগ আর কে করতে পারে? ‘এতবড় উচ্চ আদর্শ আমাদের কল্পনায়ও আসেন।’”

পদ্মিনীর জহর-ব্রতের স্থান দেখিলাম। দর্শনার্থীরা সকলে প্রণাম করিতেছে। তাহাদের দেখাদেখি আমিও মাথা নোয়াইলাম, আমার বুক কাঁপিতেছিল। হাত দুখানি অবশ হইয়া আসিল, আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম। পার্শ্বে দণ্ডয়মান রমেশদাকে ধরিয়া বলিলাম, “চল এখান থেকে যাই।”

সেই সতীরাণী স্বর্গ হইতে আমায় কি আশীর্বাদ করিয়াছিলেন জানিনা। আজ মনে হয়, যদি ভারতে পদ্মিনীর মত সতীর আদর্শ না থাকিত, তবে মানব সমাজের পথ প্রদর্শক এক উজ্জ্বল ঝুঁতুরা খসিয়া পড়িত। পুরাণে শুনিয়াছি, দক্ষ্যজ্ঞে এক সতীর অনল প্রবেশ—আর এই দেখিলাম বহু সতীর আত্মত্যাগের মহিমাময় তীর্থক্ষেত্র। বুঝিলাম, জহুর-ব্রতের তিমির' গহ্বরের অগ্নিশিখা পদ্মিনীর দেহ দক্ষ করে নাই, পাপীর ভোগ লালসাকেই পুড়িয়া ছাই করিয়া দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় আমরা বোম্বাই নগরীর অন্তর্গত মালবার শৈল পল্লীতে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতেছিলাম। ট্যাঙ্গী বিদায় দিয়া আমরা ধীরে ধীরে পদ্বর্জে চলিতেছিলাম, সেদিন আমার মন বড় খারাপ ছিল। কেন, তাহা পরে বলিতেছি। দুপুরবেলা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। রঘেশ-দা খবারের কাগজ পড়িতেছিলেন। তাহার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় নাই। আমার বিমর্শ ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। চারি-দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আমার কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা আসিল। রঘেশদা বলিলেন “হাঁরে মানু, তোর এই মলিনমুখ দেখবার জন্যই কি ঘর বাড়ী, পরিবার পরিজন ছেড়ে এসেছি? ব্যাপার কি বল দেখি?” এই বলিয়া তিনি আমাকে বাঁ হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব একবার ঝাঁকিয়া দিলেন। আমি তাঁর বুকে মাথা রাখিয়া মুখ নৌচু করিয়া রহিলাম। আমার কান্না পাইল। তিনি আমার চিবুক ধরিয়া আমার দিকে চাহিলেন। অস্পষ্ট আলোকে আমার ছল ছল চক্ষুতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি

পকেট হহতে রুমাল বাহির করিয়া আমার চক্ষের জলবিন্দু মুছাইয়া
দিলেন। এসেন্সের মৃদু স্বাস আমাকে পুলকিত করিয়া চারিধারে
ছড়াইল। আমরা নিকটবর্তী একখানা বেঞ্চির উপরে বসিলাম।

তিনি বলিলেন “মানু, তোমার জন্য সমস্ত ছাড়িয়া আসিলাম।
নিজের স্ত্রী, বিধবা মা, ছোট ভাইবোন সকলের কথা আজ তোমারই
জন্য ভুলেছি। শেষে তুমিও আমায় পরিত্যাগ করবে? তোমায়
নিয়ে কি বিপদের সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তা দেখেই বুঝতে পার
তোমায় কত ভালবাসি!” রমেশ-দা আবার আমাকে বুকে চাপিয়া
ধরিলেন। আজ আমার এ সকল আদর সোহাগ যেন ভাল
লাগিতেছিল না। সম্মুখের অস্পষ্ট অঙ্ককারের দিকে আমি স্থির
দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার হাত দুখানি কোলের উপরে
অঙ্গলিবন্ধ ছিল। রমেশ-দা আমার ডান হাতখানি তুলিয়া তাঁহার
নিজের কাঁধের উপর নিয়া রাখিলেন। আমি রমেশ-দাকে অনাদর
করিয়াছি ভাবিয়া লজ্জিত হইলাম।

চারিদিক নিষ্ঠক। পার্শ্ববর্তী প্রশস্ত পথ দিয়া শৈলবিহারী
সৌধীন লোকদের দুই একখানি মোটর গাড়ী মাঝে মাঝে মৃদুশব্দে
চলিয়া যাইতেছে। রমেশদা বলিলেন ‘চুপ করে আছিস্ কেন—কি
হয়েছে?’ আমি বলিলাম “না কিছু হয়নি। আজ কমলার
চিঠি এসেছে, তুমিত দেখেছ”। আমি ডান হাত দিয়া ভাল করিয়া
রমেশদার গলা জড়াইয়া ধরিলাম।

একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে তিনি বলিলেন “ওঁ—বাড়ীর
কথা মনে পড়েছে বুঝি—আরে তুই একেবারেই কচি খুকিটি!”
একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “আচ্ছা মানু,

বাড়ীতে তোমার কি আকর্ষণ আছে বল দেখি।—মনে কিছু
ক'রোনা ; আমি স্বরূপ কথাই বলছি। তোমার মা নাই—ভাই
বোন নাই। পিতা দ্বিতীয় পক্ষের ষড়শী পত্নীকে নিয়ে আমোদ
করে বেড়াচ্ছেন—মেয়ের দিকে ফিরেও চান্না, শোবার ঘর থেকে
কৌশল করে তোমায় সরিয়েচ্ছেন—তোমার মায়ের ছবিগানিকেও
দূর করে দিয়েচ্ছেন। স্থানে তোমার কি সুখ আছে
বল !”

আজ রমেশ-দা অমন কথা বলিলে তার উত্তর আমি অন্তরূপ
দিতাম্। কিন্তু তখন আমি ভাবিয়াছিলাম সত্যই “রমেশদা, আমি
মরুভূমি থেকে ছুটে এসে শীতল জলধারার সন্ধান পেয়েছি—
আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমার জন্য কি ছেড়ে এসেছ, তা
দেখবার আমার প্রয়োজন নাই, আমার সম্মুখে তুমি যে প্রেমের
নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছ, আমি শুধু তাই দেখছি।”

সেখানে হইতে একটা টাঙ্গি ভাড়া করিয়া আমরা সিনেমায়
গেলাম। আমার হৃদয়ের প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল। আমি মনে
করিলাম, কেন বুঝা দুশ্চিন্তার ভার বৃদ্ধি করিতেছি। যখন স্তুধার
পাত্র সম্মুখে রহিয়াছে, তখন কোন মূর্খ তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ
ফিরাইয়া চলিয়া যায় ?

কমলার যে পত্রের কথা পূর্বে বলিয়াছি তাহাতে সে আমাকে
লিখিয়াছিল যে সে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। তিনি
আমার জন্য খুব মনকষ্ট পাইতেছেন। পুলিশকে তিনি জানাইবেন
না—অথবা কোন মামলা মোকদ্দমাও করিবেন না। বিমাতা
আমার কথা মনে করিয়া কাঁদেন। হরিমতি তাহার ভবিষ্যৎ বাক্য

সফল হওয়াতে খুব আনন্দিত। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়িয়া বলেছে “সে আমি আগেই জানি”। নন্দদাদা স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। সে নাকি বলিতেছে আমি যেরূপে পারি মানুকে খুঁজে আনব।” মুকুলদার সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাবে কমলার মাস্মতি দিয়াছেন। রমেশদার বাড়ীর খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই।”

এই পত্র পড়িয়া আমার প্রাণে বড় দুঃখ হইয়াছিল। বিমাতা বেচারি বড় ভাল ছিলেন। তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু কখনও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি চতুরা নারীর মত স্বামীর মন ভুলাইতে কপটতার আশ্রয় নিতেন না। তাঁহার সরল প্রাণ পিতার ইচ্ছা অনুসারে চলিত। তাঁহার জন্য আমার কষ্ট হইল। আর কষ্ট হইল, নন্দদাদার কথা ভাবিয়া, তাহার অসাবধনতার জন্যই আমি পলায়ন করিতে পারিয়াছি। বোধ হয় এজন্য সে হতভাগ্য বাবার কাছে বকুনী থাইয়াছে। তাই বুঝি সে লেখাপড়া ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এক একবার মনে হইত, ধরা দিয়া এমন সাহসী বীরের মর্যাদা রাখি।

বোধ্যই হইতে নাগপুর হইয়া আমরা মান্দাজে আসিলাম। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ভিজগাপত্ন ও তৎপরে ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইলাম। এখানকার সমুদ্র-তীর আমার বিশেষ প্রীতিজ্ঞনক বোধ হওয়ায় প্রায় দুই মাস তথায় অবস্থান করি। তারপর পুরী হইয়া কাশী যাই। কাশীতে বাঙালীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বেড়াইতে বাহির হইলে প্রায়ই বাঙালীর সহিত

সাক্ষণ্য হইত। আমার কেবলি ভয় হয়, কখন् পরিচিত ব্যক্তির
সহিত দেখা হয়—আর ধরা পড়িয়া যাই।

আমি একদিন রমেশদাকে বলিলাম, চল এখান থেকে যাই।
চারিদিকে বাঙালী—ফস্ক করে কবে চেনা পরিচিত কেউ দেখে
ফেলবে, তখনই মুশ্কিল’। রমেশদা ইজি চেয়ারে লম্বা হাতলের
উপর পা তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানিতে টানিতে বলিলেন—
মেয়েলি বুদ্ধি নিয়ে কি শর্মারাম কাজ করে? জানিস্
এই কাশীতে যত বাঙালী আছে তার অধিকাংশই তোর রমেশ-দার
দলের। কেহবা কারো ঘরের বউ বের করে এনেচেন—কেউ বা
বিধবা পোষাতি খালাস করতে এসেচেন—কেহ আপন রক্ষিতা
নারীর হাতওয়া বদলাচ্ছেন—আবার এমন কেহ আচেন যাহারা
নিজের আত্মীয়া দ্বারা পাপ ব্যবসায় করাচ্ছেন। বাঙালীর কলঙ্কের
এই তিনটী স্থান—নবদ্বীপ, কাশী ও বৃন্দাবন। ভয় কচিস্ক কাকে?
কে কাকে নিন্দা করবে? এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়
দেখ। পথের জনসংঘ কর্তৃক লাঢ়িতা এক পতিতা নারী প্রভু
যীশুখ্রিস্টের আশ্রয় নিয়াছিল। যীশুখ্রিস্ট সমবেত জন-মণ্ডলীকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সে প্রথমে
এই নারীর প্রতি লোক্ত্ব নিষ্কেপ কর। তখন কেহই অগ্রসর হইল
না। বাইবেলে এই কথা আছে—মনে আছে? আমি বলিলাম
“হঁ, আছে। তুমি যেমন লোক, কাশী বৃন্দাবন নবদ্বীপকে সেই
ভাবেই দেখছ। পুণ্যের দিক তোমার চোখে পড়বে কেন?
তা যাই হউক, তবু চল। এখানে বেশীদিন থেকে কাজ
নেই।”

আমরা এলাহাবাদ ও আগরা হইয়া মথুরায় গেলাম।
প্রয়াগে গঙ্গায়মুনা সঙ্গমে স্নান করিলাম। তাজমহল, আগরা-
ফোর্ট ও সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি প্রভৃতি দেখিবার জন্য
পাঁচদিন আগরায় বিলম্ব হইল। প্রায় পাঁচ মাস ঘুরিয়া
আষাঢ় মাসের প্রথম তাগে আমরা মথুরায় পৌঁছিলাম। এখানে
কিছু বেশীদিন থাকিবার ইচ্ছা। এত সহর থাকিতে মথুরার উপর
রমেশদার এত মন পড়িল কেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীঘাটের নিকটে একেবারে যমুনার ধারে অল্প ভাড়ায়
একটী ভাল বাড়ী পাওয়া গেল।

ক্যাটনমেন্টের দিকে ইউরোপীয় ধরণের হোটেল একটী
আছে বটে, কিন্তু সেখানে থাকা রমেশদার মত হইল না।
টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সাহেবী ফ্টাইল আর ত চলেন।
রমেশদা বলিলেন “মথুরায় দেশীয় ভাবে থাকাই সুবিধাজনক।”
তিনি কোট প্যাণ্টুলন, টাই টুপি ঢাকিলেন। আমার পোষাকে
বিদেশীয় ভাব তেমন কিছুই ছিল না। গোড়ালী উচু জুতার
বদলে আমি নাগুরাই জুতা পরিলাম। রান্না করিবার জন্য
বামুন ঠাকুর রাখা হইল। একটী চাকরও পাওয়া গেল—সে
বাজার কঁরিত, জল তুলত, থালা বাসন মাজিত।

একদিন দেখিলাম রমেশদা গোফ কামাইয়া ফেলিয়াছেন।
আমি বলিলাম “ওকি রমেশদা, তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না।”
রমেশদা বলিলেন “ভাবনা কি—আবার গজাবে।”

কথাটা পরিহাসের বাতাসে উড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার
এইখানে শেষ হইল না—আর একদিন দেখিলাম, রমেশদা

এক নাপিত ডাকাইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, মধ্যস্থলে এক গোছা চুল শিখার মত রাখিলেন। আমার সন্দেহ হইল—
ইহার মধ্যে কোন মতলব আছে। তার পর যখন ললাটে,
নাসিকায় চন্দনের তিলক ছাপ দিয়া, কাঢ়া শূন্য কাপড় ও
মাদ্রাজী জুতা পড়িয়া রমেশদা একেবারে দ্রাবিড়ী পণ্ডিত সাজি-
লেন, তখন আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে রমেশ-দা
আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমি মুখ ফুটিয়া
কিছু বলিলাম না। সমস্ত ঘটনাটী হাসি ঠাট্টার উপর দিয়াই
শেষ হইল।

রমেশদা এক সময়ে রেঙ্গুনে থাকিতে মাদ্রাজী কথা শিখিয়া-
ছিলেন। বৃন্দাবনে রঞ্জজীর মন্দিরে যাইয়া তিনি যখন
স্বামীজি মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিলেন, আমি আশৰ্য্য
হইয়া গেলাম। রামস্বরূপ আয়ার এই নামে রমেশদার চিঠি
আসিত। অবশ্য অন্য সহরেও আমরা এয়াবৎ চন্দননামে বাস
করিয়াছি। কিন্তু এবারে রমেশদা যেন একটু বেশী সাবধান
হইতেছেন। আমাকে এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই।

কলিকাতায় গাকিতেই রমেশদা বন্ধুদের সহিত মিশিয়া
মঢ়পান অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতাম না।
বাহিরে আসিয়া হোটেলে ইউরোপীয়ান ষ্টাইলে গাকার সময়
মঢ়পানের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। আমাকেও একটু আধটু
খাইতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। আপত্তি করিয়া বলিলাম
“না—বিষেশতঃ দেহের এই অবস্থায়।” রমেশদা বলিলেন
“সে এখনও ছয়মাস দেরী, তা’বলে কি শুর্ণি মাটী করতে হয় ?

—‘আর তোমাদের অঁতুর ঘরে যা খাওয়ান হয়, সে “ভাইনাম গ্যালিসিয়াটা” কি ? সেত খাটী এক্স নম্বর ওয়ান।” রমেশদার রোজই দু এক ফ্লাস চলিত। গন্ধটা আমার সহিয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও বোতল হইতে আমিও ঢালিয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধ। মধুরার ক্যাণ্টনমেন্টে অনেক গোরা পণ্টন আসিয়াছে। চারিদিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ ও রসদ জোগাইবার ব্যবস্থা। রমেশদা বলিলেন “মানু, আমি একটু ক্যাণ্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছি, দেখি—যদি ভাল এক বোতল জোগাড় করতে পারি। এই সহরে কিছু পাওয়ার যো নাই। এরা কেবল সিদ্ধি ভাং নিয়েই ব্যস্ত।” রমেশদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি বাড়ীতে একাকী।

চাকর একখানি ডাকের চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম কমলা লিখিয়াছে। চিঠিখানা পড়িয়া আমি বজ্জাহত হইলাম। রমেশদা যে আফিসে চাকুরী করিত, তাহার তহবিল হইতে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। চারি মাসের ছুটী লওয়ার কথা মিথ্যা। রমেশদার বিরুদ্ধে সেই কোম্পানী পুলিশের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আমাকে অপহরণ করার অভিযোগ আমার পিতা না করিলেও আমার মামা (নন্দদাদার পিতা) পুলিশকে জানাইয়াছেন। এই উপলক্ষে পুলিশ আমাদের বাড়ী, মুকুলদার বাসা, কমলাদের বাড়ী, রমেশদার বোর্ডিং এবং রমেশদার বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াছে। কমলার এবং মুকুলদার নিকট হইতে

পুলিশ রমেশদার বোম্বাই ও কাশীর ঠিকানা পাইয়াছে। গোয়েন্দা
পুলিশ রমেশদার পিছু লইয়াছে।

আমার শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তারপর রমেশদার
উপর আমার অমানুষিক ক্রোধ ও যুগার উদয় হইল। আমি
কিছু বুঝিনা বলিয়া আমার সহিত এত প্রতারণ—আমি প্রাণ
দিয়া ভাল বাসিয়াছি, বিশ্বাস করিয়াছি, তার প্রতিদান বুঝি
এই জ্যন্ত ব্যবহার। আমি স্তুক হইয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার পরে রমেশ-দা আসিলেন। অতিরিক্ত মন্তপানে
তিনি মন্ত হইয়াছেন—চোখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি
কঠোর স্বরে কহিলাম “রমেশদা, তুমি যে চা’রমাসের ছুটী
নিয়েছিলে, তার উপর আরও একমাস হ’য়ে গেল, অথচ”—
আমার কথা শেষ না হইতেই রমেশ-দা জড়িত কর্ণে কহিল
“সে কৈফিয়ৎ কি তোর কাছে দিতে হবে নাকি?—তুই কি
আমার মনিব?” আমি বলিলাম, কৈফিয়ৎ চাহিনা, কারণ-ত
আমায় বলতে পার!

রমেশ।—আমি আরও তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত
করেছি। এইবার সন্দেহ মিটেছে?

আমি।—সন্দেহ নয় রমেশদা, তুমি জান, হাতের টাকা
সব ফুরিয়ে গেছে। আর এক সপ্তাহও চলবে না। যদি তুমি
এখন কল্কাতায় ফিরে না যাও, তবে অন্ততঃ ছুটীর মাসের
বেতনটাও আনাতে পার। সেওত আটশত টাকা হবে।

রমেশ।—সে ভাবনা তোমায় করতে হবে না। সিগারেটের
প্যাকেট আর দেশালাইট দাও ত।

আমি হকুম তামিল করিয়া বলিলাম “রংমেশদা, দেখছ ত আমার দেহের গতিক। এমন অবস্থায় কোন ভাল সহরে—যেখানে ভাল ডাক্তার অথবা প্রসূতি হাসপাতাল আছে—এমন স্থানে না থাকিলে আমার ভয় হয়। তাতেও অনেক টাকা খরচ হবে।

রংমেশদা উলিতে উলিতে খটীয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। সিগারেট টানিতে টানিতে বলিলেন “টাকার আর ভাবনা কি মানু। দেখছিস্ ত এক থোকে আড়াই হাজার টাকা।” রংমেশদা কাশিতে কাশিতে ‘ওয়াক্ ওয়াক্’ করিতে লাগিলেন। আমি একটা বাটী সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, “আড়াই হাজার কেন, তিন হাজার বল।” রংমেশদা চঙ্কু বিস্ফারিত করিলেন। তাহার বমির ভাব চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম “রংমেশদা, তুমি তিন হাজার যে ভাবে পেয়েছ তা আমি জানি। সেই রকম রোজগারের আর এক কানাকড়িও আমি চাহিনা। যদি ক্ষমতা থাকে, সৎপথে থেকে উপার্জন করে আমায় রাখ—চুরি জোচুরির পথে গিয়ে নিজে মজোনা—আমায়ও মজিও না।”

রংমেশদা নেশার ঘোরে বলিতে লাগিলেন “মানু, তোকে নিয়ে আমি সর্বত্যাগী হলুম, আর তুই আমায় চোর বল্ছিস ? আমি কার জন্যে চুরি করেছি ?—কার জন্য স্ত্রীকে ছেড়েছি, মাকে ছেড়েছি ?—কার জন্য জেলে পা বাঢ়িয়েছি ? যাঃ—চলে, এই দুনিয়ায় দরদী কেউ নেই—প্রেমের মর্যাদা কেউ বুঝলে না। ওরে, চোর না হলে কেউ প্রেমিক হয় না। এই মথুরা তার

সাক্ষ্য দিবে। বেশ, তুমি তবে সাধুসজ্জন নিয়ে থাক—আমি এই মূলতে চল্লম।

রমেশদা উঠিয়া টলিতে টলিতে জুতা পরিলেন, জামা গায়ে দিলেন। একি, সত্যই তিনি চলিলেন। অমি ছুটিয়া যাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম, “রমেশদা আমায় ছেড়ে যেওনা, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর—আমার অকৃল সমুদ্রে ভাসিও না।”

রমেশদা এক লাখি মারিয়া আমাকে দূরে ফেলিয়া ক্রোধেন্মত স্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, “চুপ রও সংতানী,—আমি তোমার কোন কথা শুন্তে চাই না। তোমার ধর্মজ্ঞান নিয়ে তুমি থাক।” নেশার ঘোরে তিনিও পড়িয়া যাইতেছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বিচানায় শোয়াইয়া মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর খুব বমি হইতে লাগিল। বিচানা মেজে সব ভাসিয়া গেল। দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। বামুন ঠাকুর অথবা চাকর হইরা কেহ কাছে আসিল না। আমি নিজেই বাল্তি করিয়া জল আনিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিলাম। সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও আহার হইল না। আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রিতে তাঁর খুব ঘাম হইয়া দেহ একেবারে হিম হইয়া গেল। আমার বড় ভয় হইল। মানসিক উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সারা রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা নয়টার সময় রমেশদাৰ চৈতন্য হইল। তাঁহাকে শ্঵ান করাইয়া একট গৱম দুধ দিয়া কোকো তৈয়াৰী করিয়া

খাইতে দিলাম। কমলার চিঠিখানি তিনি আছস্ত পড়িলেন।
বুঝিলেন বাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের প্রণয়ের নির্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল।
বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ আসিল। রমেশদাকে এক নৃতন চক্ষে
আমি দেখিতে লাগিলাম। তাহার চরিত্রের নানাদিক আমার
সম্মুখে পরিষ্ফুট হইয়া উঠিল—লম্পট, চোর, বিশ্বাসঘাতক,
মিথ্যাবাদী, মাতাল !

পঞ্চম

পাপের পথে

তারপর হইতে নানা খুটিনাটি লইয়া রমেশদার সহিত আমার
প্রায়ই ঝগড়া হইতে লাগিল। হাতে নগদ টাকা যাহা ছিল,
সমস্ত খরচ হইয়া গিয়াছে, মুকুলদার কাছে চিঠি দেওয়ায় তিনি
পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছিলেন—তাহাও অতি কষ্টে। তিনি অন্ন
বেতনে সামান্য মাট্টারী করেন। সেই পঞ্চাশ টাকার মধ্যে
আটাশ টাকা রমেশদা মদ খাইয়া উড়াইয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন
আসে অখন এমনই হয়। বেতন না পাইয়া বামুন ঠাকুরটি
চলিয়া গিয়াছে। দুই বেলা আমিই রান্না করি। আমি রন্ধন কার্য
জানিতাম না—কখনও শিখি নাই। অসুস্থ দেহ লইয়া আগুনের
তাপে ও ধোঁয়ায় আমার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিত।

মথুরায় একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখিতে বলিলাম। কিন্তু
সে কথা রমেশদা গ্রাহ করিলেন না। শীতের জন্য এক সুট,

দামী পোষাক ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা সংগ্ৰহ হইল। ক্রমে ক্রমে আমাৰ গহনাগুলিও বিক্রয় কৰিলেন। আমাৰ বিমাতা জন্মদিনেৰ উপহাৰ স্বৰূপ আমাকে যে একছড়া সোনাৰ হার দিয়াছিলেন, তাহা আমি বিক্রয় কৰিতে দিব না বলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই অপৱাধে আমাৰ উপৰ খুব মাৰ-ধৰ ও বকুনি হইল। আজকাল কৃথায় কথায় লাথি, চড়-চাপড় এসব আমাৰ ভাগ্যে জুটিত। আমি কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহা সহ কৰিতাম।

রমেশদা আমাকে একদিন বলিলেন, “কমলাকে কিছু পাঠাইতে চিঠি লেখ।” আমি বলিলাম, কমলা দৱিদ্ৰ ঘৰেৱ মেয়ে, সে টাকা পাইবে কোথায় ?” ইহা লইয়া রমেশদা আমাৰ উপৰ খুব রাগ কৰিলেন। আমি অগত্যা কমলাকে চিঠি লিখিলাম। সে কুড়িটাকা পাঠাইল। তাহাও কয়েকদিনেই ফুৱাইয়া গেল।

আমাৰ দুই একখনা দামী কাপড় ও গহনা তখনও ছিল। রমেশদা নানা কৌশলে তাহা আমাৰ নিকট হইতে নিয়া বিক্রয় কৰেন। কেবল সেই সোণাৰ হারছড়া তখনও আমি দেই নাই। একদিন তিনি আসিয়া বলিলেন “মানু, বুন্দাবনে প্ৰেম-মহা-বিদ্যালয়ে একটা প্ৰফেসোৱী কাজ পেয়েছি। রাজা মহেন্দ্ৰ প্ৰতাপেৰ সঙ্গে আমাৰ আলাপ হয়েচে। লোকটা ব্ৰিটিশ গভৰ্ণমেণ্টেৰ ভয়ানক বিৱোধী। আমাৰও সেইভাৰ, তুমিত জানই। রাজা খুব খুসী হলেন। আমাকে এখন মাসিক একশত টাকা বেতন দিবেন।” আমি শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

রমেশদা চিন্তাকুল চিত্তে কহিলেন “একসুট পোষাক

“তৈয়ারী করা দরকার—কিন্তু টাকারই ত অভাব।” আমি
বলিলাম, “আমার সোণার হারচড়া বাঁধা রেখে কিছু টাকা
ধার কর, তারপর একমাসের বেতন পেলেই ঢাঢ়িয়ে আনতে
পারবে।” রমেশদা মুখ ফিরাইয়া গন্তীরভাবে বললেন “না,
তাও কি হয়, তোমার সৎমার স্নেহের উপহার।” আমি বুঝিলাম,
সেদিনের ব্যাপারে আমার উপর এ অভিমান ও শ্লেষ। আমি
তখনি আমার হাতবাক্স খুলিয়া রমেশদার কোলের উপর হারটা
ফেলিয়া দিলাম। সেই হার বন্ধকে পাওয়া দেড়শত টাকা
রমেশদার হাতেই খরচ হইয়াছে। অথচ প্রফেসারী চাকুরীর জন্ম
যে একসূট পোষাক তৈয়ারী করিবার কথা ছিল তাহা হয় নাই।

আমার সন্দেহ হইল, চাকুরীর কথা মিথ্যা। আমার শেষ
সম্বল হার-চড়া হস্তগত করিয়া তাহা দ্বারা মদের মূলা সংগ্রহ
করাই রমেশদার উদ্দেশ্য ছিল। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম
“কবে থেকে প্রফেসারী আরম্ভ করবে ?” রমেশদা বেশ চতুরতার
সহিত উত্তর করিলেন “রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হঠাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে
চলে গেছেন। গর্বণ্মেণ্ট তাঁর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করেছে।
এইত হয়েছে এখন মুক্ষিল।” পাছে আমার সন্দেহ হয়, সেইজন্ম
‘হিন্দু নামক সংবাদপত্র হইতে পড়িয়া আমাকে রাজা মহেন্দ্র-
প্রতাপের বিষয় শুনাইলেন।

মথুরায়, বৃন্দাবনে তখন ঝুলন্তের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।
আমি রমেশদাকে বলিলাম “চল একবার দ্বারকাধীশের মন্দিরে
যাই।” তিনি বললেন “না, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।
তুমি লক্ষ্মনকে সঙ্গে নিয়ে যাও।” লক্ষ্মন আমাদের চাকরের

নাম। আমি বাহির হইয়া গেলাম। রমেশদা বাড়ীতে রাহিলোনো
বুলনের সময় মথুরার মন্দিরে মন্দিরে খুব আমোদ প্রমোদ হয়।
ধারকাধীশের মন্দিরেই সর্বাপেক্ষা বেশী। স্বর্ণ-রৌপ্য-মণ্ডিত বৃহৎ
সিংহাসনে ঠাকুরকে বসাইয়া দোলান হয়। সমস্ত মন্দির আলোক,
পুষ্পপত্র, পতাকায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শ্রী ধূরণ করে।
গায়কগণ শুল্লিত স্বরে ভজন গানে রত থাকেন। এই সকল
দর্শন করিলে মানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও শার্স্টির ভাব আসে।

আমরা বিশ্রাম ঘাটের আরতি এবং আরও দুই তিনটা
মন্দিরে বুলন দেখিয়া রাত্রি প্রায় নটার সময় বাড়ীতে ফিরিলাম।
ঘরে যাইয়া দেখি : মেশদা নাই। আলো জ্বলিতেছে। শোবার
খাটিয়ার উপরে একখানি চিঠি রহিয়াছে। পাড়িয়া দেখিলাম
তাহাতে একপ ভাবের লেখা ছিল—

“মানু, তোমার সঙ্গে আর থাকা যায় না। তুমি আমায় চোর,
লম্পট, মাতাল বলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছ। যেখানে ঘৃণা ও
সন্দেহ, সেখানে ভালবাসার স্থান নাই। আজ আমি তিন হাজার
টাকা আফিসের ক্যাশে গুঁজে দিলৈই আমার চোর অপবাদ
যুচ্বে—আরও দুঁচার দশটা মেয়ে বের করলেও, আমি সমাজে
বুক ফুলিয়ে বেড়াব—আর মহুপান, সেতু বড়লোকের লক্ষণ।
তুমি নিজের ভাল বুঝলে না। তোমার আর উদ্ধার নাই। দেখব
তোমার নব জাগ্রত নীতিশূন্য তোমাকে কতদূর রক্ষা করে।
আমি চলাম—আমায় খুঁজোন। পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে।
তুমি অবিলম্বে এই বাড়ী ছেড়ে যেও।”

আমার র্থান মনে হইল, একটা পর্বত-প্রমাণ বোৰা যেন-

আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে আমি যেন জলের উপরে নাক তুলিয়া একটু নিশ্চাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। রমেশদার ব্যবহার আমার এত অসহ হইয়াছিল। আমি স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, ভগবান বুঝি তাহারই পথ খুলিয়া দিলেন।

রাত্রিতে রান্না^{*} খাওয়া হইল না। গভীর রাত্রিতে আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা আসিল। এখন কি করি, কোথায় যাই। ভাবিলাম, দুর্বল চিন্ত হইলে চলিবেন। আনিদ্রায় রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিয়া চারিদিকে চাইতেই রমেশদার জন্য দুঃখ হইল। চাঁতেয়ারী করিলাম না। লজ্জনকে ডাকিয়া বলিলাম “আমি বৃন্দাবনে যাব, একখানি একা অথবা টাঙ্গা ঠিক করে দাও।”

আমার গহনার মধ্যে হাতে দুগাছা সোনার চূড়ী ও কাণে একজোড়া দুল মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সে সমস্ত বিক্রয় করিয়া চাকরের তিনমাসের বেতন চুকাইয়া দিলাম। আমার হাতে কিছু টাকাও রহিল। সেই সময়ে কমলার একখানি চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, “রমেশবাবুর সঙ্গে পলায়ন করা তোমার ভুল হইয়াছে। এ প্রকার প্রেমের মিলন যেমন হঠাৎ এসে পড়ে, বিচ্ছেদও তেমনি হঠাৎ হয়ে যায়। তোমাদের উভয়ের বিনাহে এমন বিশেষ কিছু বাধা ছিল না। তোমার পিতারও বোধ হয় অগত হ'ত না। এখনও তুমি ফিরে এসে ভূম সংশোধন করতে পার।”

কমলার উপদেশ আমার ভাল লাগিল না। তাহার পত্রের কোন উত্তর দিলাম না। বৃন্দাবনে যাইয়া সেবা-কুণ্ডের নিকটে

একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইলাম। তাহার আশে পাশে আরও অনেক বাঙালী স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহাদের প্রায় সকলেই অধিক বয়সের বিধবা। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, “মথুরায় থাকিতে আমার স্বামী ও শাশুড়ীর কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট চিঠি লিখিয়াছি।” সকলেই আমার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিল।

একমাস পরে আমি এই ঘর ছাড়িয়া কেশীঘাটের নিকট যাইয়া বাস করিতে লাগিলাম। হাতের সামগ্র্য টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে একবার জুর হইয়া প্রায় দুশ্রদিন ভুগিয়া-ছিলাম। ভিক্ষা করিতে পারিলে আহারের অভাব হয় না, কিন্তু আমার শরীর এত দুর্বল হইয়াছিল যে চলিতে পারিতাম না।

দুইদিন কিছু খাই নাই। ভিক্ষা চাহিতে জানি না। বংশী-বটের নিকট রাস্তার ধারে শুইয়া আছি। ভাবিতেছি, এখন মরণ আসিলেই বাঁচি। একজন বাঙালী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন, তিনি আমার দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ হৃদয়ে আমাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। ইনি এক সাধু মোহন্তের শিষ্য। মোহন্তজীর বৃহৎ আশ্রম—তাহাতে দেব-বিগ্রহ ও বহু শিষ্য-সেবকাদি রহিয়াছে। মোহন্তজী বাঙালী। তাহার বয়স প্রায় ৬৫, মস্তকে জটা, আবক্ষলমিত দৌর্য শক্তি—অঙ্গে চন্দন বিভূতি। তিনি আসনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া শিষ্যকে বলিলেন “একে নিয়ে এসেছে কেন? এ যে অস্তঃস্বত্ব। কোন দুষ্ট লোকের প্ররোচণায় পালিয়ে এসেছে, এখন সেই লোকটী সরে পড়েছে। এর অনেক কষ্টভোগ আছে। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ ঠাকুরের প্রসাদ একে দাও।”

আমি একটু স্মৃত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন “মা, আমার এই আশ্রমে ত স্ত্রীলোক রাখ্বার নিয়ম নাই। বিশেষতঃ তুমি গর্ভবতী—সম্মুখে অনেক বিপদ। তুমি এখন কি করবে বল।” আমি কাঁদিয়া তাহার পা জড়াইয়া বলিলাম, “বাবা আমি ‘মহাপাপী, আমায় উকার করুন। আপনি ত মনের কথা সবই জানেন।’” মোহান্তজী বলিলেন “হঁ, আমি সব জানি। তোমার মনের কথা তুমি যাহা না জান আমি তাহাও জানি। এই অনুত্তপ্ত ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রকৃত। কামপ্রবৃত্তি একবার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় গজাইয়া উঠিলে আর রক্ষা নাই। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগশোকে, সাময়িক বিচার-বুদ্ধিতে সেই পাপ বৃক্ষকে মাঝে মাঝে ছেদন করিয়া দেয় ; কিন্তু আবার অনুকূল অবস্থায় নৃতন অঙ্কুর জন্মে। একমাত্র ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভনকে স্থায়ীরূপে জয় করা যায় না। ইহার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন।”

আমি অশ্রুকৃক্ষ কর্ণে বলিলাম “আমায় ক্ষমা করুন, আমায় আশ্রয় দিন।” মোহান্তজী স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন “মা, অন্নবস্তু দেওয়ার দয়া তুমি অনেক পা’বে। সেই দয়ার অভাব সংসারে নাই। তোমাকে এখন যে আক্রমণ করেছে সে দারিদ্র্য নহে—সে তোমার দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষণ পাওয়ার আশ্রয় ত তুমি চাওনা, তোমার প্রার্থনা অন্নবস্তু ও বাসগৃহ। আচ্ছা, তুমি ঘরে ফিরে যাবে ?”

আমি সম্মতি জানাইলে তিনি আমার পিতার নাম টিকানা লিখিয়া লইলেন। পরে শিশ্যকে ডাকিয়া বলিলেন “কলিকাতায় চিঠি লেখ। আশ্রমের পাশের বাগানে রামকিষণ তাহার স্ত্রী ও

চোট দুইটী ছেলে নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটীও থাকবে। সব ঠিক করে দাও।” শিশু চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, “তোমার পিতা তোমায় পুনরায় গ্রহণ করবেন ব'লে, আমার মনে হয়ন। তাঁকে ত সমাজ মেনে চল্লতে হচ্ছে। পাপ—প্রলোভনের বশীভূত হওয়া একটা গাধ্যাত্মিক ব্যাধি। প্রায়শিকভাবে দ্বারা শুন্দি না হ'লে চিন্ত কিছুতেই ঈশ্বরাভিমুখী হ'তে পারেন।”

রামকিষণের পরিবারের সহিত আমি আশ্রমের বাগানে বাস করিতেছি। রামকিষণ বাগানের তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যহ গোয়ালঘর পরিষ্কার করা, তিনটী গাড়ী ও কয়েকটী বাচুরকে খেল, ভূষি, খাওয়ান, দশ বার কলসী জল ইন্দারা হইতে তুলিয়া বাগানে দেওয়া, ঠাকুরের ভোগ রান্না করিবার পাত্রাদি মাজা, সাধুদের ভোজন হইয়া গেলে সেই স্থান পরিস্মার করা, আমার নিজের আহারের জন্য গম পিয়িয়া লওয়া আমার নিতা কর্তৃবাকুপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই সকল কার্য করিতাম। কিন্তু আমার বড় পরিশ্রম বোধ হইত। মোহান্তজীর নির্দেশ অনুসারে আমার মাগার চুল চোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। কেবলমাত্র প্রতাতে মন্দল আরতির সময় আমি মন্দির প্রাঙ্গণে ঘাটিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। মোহান্তজী বাগানে আসিলে প্রয়োজন মত আমার সহিত কথাবার্তা বলিতেন।

একমাস পরে আমার পিতার চিঠি আসিল। তিনি মোহান্তজীকে জানাইয়াছেন যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। এমন ক্ষ্যাকে তিনি মৃতার শ্যায় জ্ঞান করেন। তখন তক

করিবার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমার শরীর ও মন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ আমি পিতার কথার উত্তর দিতে পারি। আমার এই আত্মচরিত লেখা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পূর্বে গত ঝুলন্তের সময় আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। সেখানে শ্রোহন্তজীর সঙ্গে আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করি। তাহার বিবরণ যথাস্থানে^১ লিখিব। তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম “বাবাজী, আমি মহাপাপী, সমাজে আমার স্থান নাই—পিতা আমায় পরিতাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মান, মর্যাদা, অর্থসম্পত্তি, দেহমন বিক্রয় করেছে, এ দেখুন, তাদেরে সমাজ মাগায় তুলে রেখেছে—তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত—ধনী ও প্রতিপত্তি-শালী, বলিয়া সম্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি-মোহন্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া শুনিয়াও নৌরব। কোটে, কাউন্সিলে, করপো-রেশনে, গুরুগিরিতে কোথাও তাদের কোন বাধা নাই। আর আমরা কবে বালিকা-বয়সের নির্বুদ্ধিতার জন্য এক ভুল করে ছিলাম, তার ফলে এই বার-বৎসর ধরে, জুলে পুড়ে মরঢ়ি। এই ত আপনাদের সমাজের বিচার !”

তিনমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন মোহন্তজী বাগানে তাঁহাকে শামকিষণ তাঁহাকে বলিল, “বাবা, এ যে পোয়াতী মেয়ে, এত খাটুনীতে পেটের ছেলেটার কোন কিছু না হয়।” আমি তখন নিকটেই বসিয়া গোবরের ঘুঁটে তৈয়ার করিতে

ছিলাম। মোহন্তজী বলিলেন “পেটের ছেলেকি আর বেঁচে আছে! এখন কোনরূপে প্রসব হয়ে গেলে ভাল। এইটুকু পরিশ্রম না করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।” রামকিষণ আশ্চর্য হইল। মোহন্তজী বলিলেন “মেয়েটার দেহে কুৎসিত ব্যাধি প্রবেশ করেছে। প্রবৃত্তির উভেজনায় মানুষ স্বাস্থ্যবিধি ভুলে যায়।”

যথা সময়ে আমি একটী মৃত পুত্র প্রসব করিলাম। রামকিষণের স্ত্রী আমার সেবাশুশ্রায় রত হইল। এই সরল প্রকৃতি অশিক্ষিতা কৃষকরমণীর মাতৃসম স্নেহের কথা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। কিছুদিন পূর্বে মথন পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন রামকিষণের স্ত্রীর খোঁজ করিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম আমি যাইবার আটমাস পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সন্তানপ্রসবের পর আমার নানা রোগ দেখা দিল। কিছু খাইতে পারিতাম না। সন্ধ্যার সময় অল্প জর হইত। সঙ্গে সঙ্গে পেটের অসুখ। আমি একেবারেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। মোহন্তজী যথাসন্তুষ্ট আমার চিকিৎসার বাসন্তা করিয়াছিলেন। প্রায় চারিমাস ভুগিয়া আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে আমি বিছানায় পড়িয়া মাথার যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছিলাম। আমার মনে হইল আম যেন আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে আছি। মা আমার কাছে বুসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। আমি ঘুমের ঘোরে বুলিলাম “মা তোমরা যে খিয়েটারে যাবে, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।” মা বলিলেন “না,—তুই এখন ছেলে মানুষ।” তারপর কে

আসিয়া, মাকে ডাকিল। মা উঠিয়া গেলেন। আমি চৌৎকার করিয়া বলিলাম “মাগো—আমায় নিয়ে যাও,”—রামকিষণের স্ত্রী পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। আমি তখনও কাঁদিয়া বলিতেছি “মাগো, আমায় নিয়ে যাও গো।” এই স্বপ্নের কথা আমি মোহান্তজীকে বলিয়াছিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, “তোমাকে আরও অনেক ভুগ্তে হবে।” আমি দাক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন “মা, আমি দৈবকে অতিক্রম করতে পারিনা। দাক্ষা নেবার তোমার এখনও সময় হয় নাই।”

আরও ছয় সাত মাস গেল। আমার আশ্রম বাস প্রায় এক বৎসর হইল। শরার একটু ভাল হইয়াচ্ছে, এখন অমের কার্যও নিয়মিত করিতে পারি। মোহান্তজীর শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নিদিষ্ট সময়ে বাগানে যাইয়া ঢাকুরের ভেগের জন্য তরৌতরকারী ফলমূল শাকসজ্জী লইয়া আসিতেন। ইহাদের একজনের সহিত কোন কথা প্রসঙ্গে আমার কুদৃষ্টি দূর হইতে মোহান্তজী লক্ষ্য করেন। আমি যদিও তাহার প্রতি কৃতাবে আসক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি ছিলেন নির্মল চরিত। তবুও তদবধি তাহাকে আর বাগানে পাঠান হইত না।

আমি এক দার্ঘ প্রেমপত্র লিখিয়া তাহাকে দিবার জন্য এক দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় আশ্রমে প্রবেশ করি। জানিতাম, তখন মোহান্তজী তাহার আসনে ধানসূ থাকেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ বৃক্ষের তলায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, মোহান্তজী আমার দিকে আসিতেছেন। আমি ভীত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ‘এ সময়ে তুমি আশ্রমে

এসেছে কেন ? এখন তোমার আসিবার কথা নয় !” আমি কিছু
মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তখনই উত্তর দিলাম, “শ্যামলী গাইয়ের
বাচুরটা এইদিকে ছুটে এসেছে ।” মোহান্তজী গন্তীর স্বরে অঙ্গুলি
দিদৰ্দেশ করিয়া বলিলেন “বাহিরে যাও—বাচুর এখানে আসেনি ।
এলেও সে রামকিষণের কাজ—তোমার নয়—”।

পরদিনই মোহান্তজী আমাকে ডাকিলেন। আমি সভায়ে
তাঁহার সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার নিকটে আর একজন প্রৌঢ়
বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। মোহান্তজী আমাকে বলিলেন
“তোমাকে আজই এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে কলিকাতায় যেতে
হবে । সেখানে ইনি তোমার সকল ব্যবস্থা করে দিবেন ।”
আমি মনে মনে শুধু হইলাম ।

মোহান্তজী সাংসারিক জীবনে একজন উচ্চ পদস্থ বাস্তি
ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার অনেক বন্ধু বৃন্দাবনে যাইয়া
তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও ধর্মালোচনা করিতেন। যে ভদ্র
লোকটীর সঙ্গে আমি কলিকাতায় আসিলাম, তিনি মোহান্তজীর
বন্ধু । তাঁহার গৃহে আমি প্রায় দশ দিন অবস্থান করি ।

কলিকাতা নগরের উপকণ্ঠে কোন স্থানে শ্রীযুক্ত—দাস একটী
নারী—উদ্ধার-আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি একজন
আইন ব্যবসায়া । দেশকন্যা বলিয়াও প্রসিদ্ধ । মোহান্তজীর
বন্ধু সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী আমাকে নারী-উদ্ধার-আশ্রমে
রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দাসের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল ।

আমার জীবনের ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইল । পিতার
অনাদর, কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ আমাকে পাপের পথে আনিয়াছে ।

আমি কখনও সংযম শিখি নাই। প্রবৃত্তির অনলে কেবল ইঙ্গন ঘোগাইয়াছি। গল্ল, উপন্যাস পাঠ করিবার ফলে সমাজ শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাবই কেবল আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াচ্ছে। উজ্জেনার বশে কার্য্যের পরিণামের দিকে দৃষ্টি যায় নাই।

পতিতা নারীদের মধ্যে যাহারা এইরূপে পর-পুরুষের অবৈধ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কৃপণে আসে, তাহাদের সকলের ভাগ্যেই এই দশা ঘটে। সেই পুরুষটী অবৈধ বালিকার সর্ববনাশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাকে ঢাকিয়া যায়। এমন কোন পতিতা নারী নাই, যে আমরণ তাহার প্রগম প্রণয়ীর সহিত বাস করিতেছে। অভিজ্ঞতা হইতে ইহার যুক্তিসংজ্ঞ কারণ আমি দেখাইয়া দিতেছি।

অবৈধ প্রেম উজ্জেনার বশেই জন্মে। উজ্জেনা মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও তাহা কদাচ বিচার বুদ্ধি প্রসূত নহে। স্মৃতরাং যে প্রেম অন্নেতেই জন্মে—তাহা অন্নেতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবৈধ প্রেমে মিলিত নারীপুরুষের বিচ্ছেদের কারণ—একের বা উভয়েরই দোষ অথবা অবস্থার পীড়ন। অর্থাত্বান, গর্ভসঞ্চার, রূপ-বিকৃতি, এই সব হইল অবস্থার পীড়ন। মন্ত্রপানের অভ্যাস, অপরের প্রতি আসক্তি এই সব হইল নারী পুরুষের দেষ।

আমাদের ব্যাপারে দুই-ই ঘটিয়াছিল। বমেশদার মন্ত্রপান ও আমার অসময়ে সন্তান সন্তান আমাদের বিচ্ছেদের কারণ। যদি রমেশদা হিন্দুর সামাজিক রীতি অনুসারে আমাকে বিবাহ

করিয়া আমার স্বামী হইতেন, তবে তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর কিছু না হউক—শেষকালে একটা আইনের ভয়ও থাকিত—লেকলজ্জা ও সমাজ শাসন না হয় চার্ডিয়াই দিলাম। অবৈধ প্রেমে যেমন মিলনের স্বাধীনতা আ.চ—তেমনি বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও আছে। তাই রমেশদা অনায়াসে আমাকে চার্ডিয়া গেলেন। সমাজ আজ রমেশদাকে প্রশংসাই করিব। আমিই হইয়াছি নিন্দার ভাগী। রমেশদা আমাকে শেষ কথা সত্যই বলিয়া গিয়াছেন।

তারপর, এত দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার শিক্ষা হয় নাই। মোহন্তজীর আশ্রমে এমন পুণ্যের বাতাসের মধ্যে থাকিতেও দুঃপ্রবৃত্তির অঙ্কুর আবার আমার হৃদয়ে দেখা দিয়াছে। সয়তানের প্রলোভন সুখ-সুর্গের ছবি লইয়া আমার সম্মুখে আসিল। আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম।

ষষ্ঠ

চেহ বিক্রম

যে সকল স্ত্রীলোক পাপ পথ চার্ডিয়া সন্তানে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা এই উদ্ধার আশ্রমে স্থান পাইত। কোন প্রকার শিল্প কার্যাদির দ্বারা জীবিকা অর্জনের উপায় তাহারা অবলম্বন করিত। আবার এমন স্ত্রীলোকও সেখানে ঢিল, যাহারা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। উহার। আমার মত এইরূপ ঘটনা চক্রে জড়িত—সমাজ অথবা পরিবারে তাহারা

যাইতে পারে না। তাহাদের জীবনের গতি অস্থির। উদ্ধার আশ্রমে খাওয়া-পরা পাইয়াই যে তাহারা স্বুখী, আমার তাহা বোধ হইল না। ইহাদের সকলেই কিশোরী বা যুবতী। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন প্রায় ১৩।১৪ জন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে জন পাঁচেক প্রোটা বিধবা ব্যতীত আর সকলেই এই শ্রেণীর।

আমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যে সকল স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় অথবা কু-লোকের প্ররোচনায় ঘরের বাহির হইয়া আসে—অন্নবস্ত্রের অভাবই তাহাদের প্রধান বিপদ নহে। ‘কি থাইব’—এই চিন্তা অপেক্ষা ‘কি রূপে থাকিব’ এই ভাবনাই তাহাদের বেশী করিতে হয়। কলিকাতা সহরে স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার বাবসায় ও চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারে। তাহাতে গ্রামাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু আমি দেখিয়াছি এ সকল বাবসায় ও চাকুরী যে সকল স্ত্রীলোক অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রায় পতিতা নারীর পথে চলিতেছে। ইহার কারণ, তাহারা কখনও বিবাহিত জীবনের সংযমের মধ্য দিয়া আসে নাই। পানওয়ালী, মেস্ বোর্ডিং হোটেলের বা গৃহস্থ বাড়ীর বি চাকুরাণী, বাজারের মাছ তরকারী ফল মূল প্রভৃতি বিক্রয়-কারিণী, রাঁধুনি, কারখানার মজুরাণী, মশলা বাড়াই বাচাই-ওয়ালী, থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীর্তনওয়ালী, শুশ্রাকারিণী, সঙ্গীত-শিল্পিণী, প্রসবকারিণী দাই, মেয়ে ডাক্তার, রেলের টিকিট আফিসে / ও টেলিফোনের মেয়ে কেরাণী—ইহারা সকলেই স্বীয় জীবিকা / নির্বাহের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু

তাহা সকল সময়ে হয় না। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি একথা বলিতেছি।

উদ্ধার আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের নিকট আমি পিতার পরিচয় ও বাড়ীর ঠিকানা সমস্তই গোপন করিয়াছিলাম। তাহারা শুধু এইমাত্র জানিলেন, আমি উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। কুমারী অবস্থায় কোন দুষ্ট লোক আমাকে ঘরের বাহির করিয়া নিয়াছিল। সে গর্ভাবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া পলাইয়াছে। রমেশদার নামও আমি প্রকাশ করিলাম না। আমি লেখাপড়া কিছু জানি, ইহা প্রকাশ হইল।

বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা আসিতে আমার খুব আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাহার কারণ, আমি আশা করিয়াছিলাম, তার যাহাই হউক অন্ততঃ মুকুলদা ও কমলাকে দেখিতে পাইব। অকুল সমুদ্রে এই দুইটী বন্ধু আমার তৃণ-স্মরণ। কিন্তু উদ্ধার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাদের খবর পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

শীঘ্ৰই কয়েকটী সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ইহাদের মধ্যে রাজবালা ও কালীদাসী এই দুইজন ছিল প্রধান। ইহাদের বৰ্ণ এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আরও কয়েক-বার উল্লেখ করা হইবে। স্মৃতিরাঙ্ক ইহাদের একটু পরিচয় দিতেছি। রাজবালা সোণার-বেণের মেয়ে। বাপের বাড়ী কলিকাতায়, অল্লবয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা ও শুভের উত্তয় পরিবারই সঙ্গতিপন্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের এক বৎসর পরেই হতভাগিনী বিধবা হয়। তৎপরে পিতার প্রতিশৈ এক পূর্ববঙ্গবাসী কায়স্ত যুবকের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় জন্মে

রাজবালার এক জ্যেষ্ঠা ভাতৃবধূ এই ব্যাপারে তাহাকে গোপনে
সহায় করিত। যুবকটী স্বদেশী আন্দোলনের সময় খুব “বন্দে
মাতরম্” করিয়া বেড়াইত। তিনি বৎসর ধরিয়া এই গুপ্ত প্রেম-
লীলা চলিতে থাকে। অবশেষে রাজবালার সন্তান-সন্তান
হওয়ায় প্রেমিক যুবক পলায়ন করে। রাজবালা কিয়ের সহিত
গঙ্গাস্নানের অঞ্চলায় বাড়ীর বাহির হইয়া আসে। আর সে ফিরিয়া
যায় নাই। তারপর নানা দুঃখ দুর্দশার আবর্তে ঘুরপাক থাইতে
থাইতে এই উদ্ধার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

কালৌদাসী সবিবা, কামারের মেয়ে। সে রূপসী ছিল। বর্দ্ধমান
জেলার কোন পল্লীগ্রামে তাহার শক্তির ঘর। স্বামীর নিকট হইতে
দুর্ব্বলের তাহাকে বলপূর্বক অপহরণ করে। তাহারা এক
বৎসর ধরিয়া তাহাকে নানাস্থানে ঘুরাইয়া বেড়ায়। ইহা লইয়া
মামলা মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমার পরে কালৌদাসীর
স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিল না। তাহার এক আত্মীয়ের পরামর্শে
সে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে যাইতেছিল। বর্দ্ধমান সহরের
কোন উকীল জানিতে পারিয়া তাহাকে এইখানে পাঠাইয়া দেন।

ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম, উদ্ধার আশ্রমটী আমাদের পক্ষে
নিরাপদ স্থান নহে। অন্নবন্দের কোন ক্লেশ নাই। আমাদের
মধ্যে যাহারা রূপযৌবন সম্পন্না, তাহাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের মধ্যে
কাহারও কাহারও একটু বিশেষ দৃষ্টি। আমার উপর তাহাদের
শীঘ্রই অনুগ্রহ পড়িল। আমাকে কাজ কর্ম করিতে হইত না।
আমার থাবিবার ঘর বিবিধ আসবাব পত্রে সজ্জিত হইল। আমি
অভিশয় প্রীত হইলাম। আমার ভাল কাপড় চোপড়, দামী জামা

সেমিজ, পরিপাটী বিছানা। অন্যান্য মেয়েরা কেহ কেহ আমাকে
এজন্য সুর্বা করিত। রাজবালা ও কালীদাসী আমাকে দেখিলেই
মুচ্চি হাসিয়া বলিত, “এবার তোর ভাই কপাল ফিরেচে।”

কর্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন আমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট
হইলেন। আমিও ধরা দিলাম। তিনি আমার ঘরে মাঝে মাঝে
রাত্রি যাপন করিতেন। জানিলাম, আমার মেয়ে-বন্ধুদের গৃহেও
কর্তৃপক্ষদের অপর কেহ কেহ গোপনে যাতায়াত করিয়া থাকেন।
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।

একদিন আমি আমার শুপ্ত প্রণয়ীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব
করিলাম। কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। আমার সমবয়সী
মেয়েরা মিলিয়া মাঝে মাঝে আমাদের শুপ্ত প্রণয়ের কথা তুলিয়া
হাস্ত পরিহাস করিত। রাজবালা ও কালীদাসীর সহিত প্রাণের
কথা হইত। আমার পরামর্শে উহারা দু'জনেও বিবাহের প্রস্তাব
করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমি বলিলাম “ভাই,
যদি রূপ, যৌবন বেচ্ছে হয়, তবে লুকিয়ে চোরের মত কেন—
একেবারে বাজারে নেমে দর যাচাই করে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়
করব।” রাজবালা ও কালীদাসী সেইদিন হইতে তাহাদের
প্রণয়ীদিগকে আর ঘরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমিও
তাহাই করিলাম। আমাদের উপর নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচার
আরম্ভ হইল। আমরা স্থির করিলাম, উদ্ধার আশ্রমে আর
থাকিব না, কিন্তু আমরা নিরাশ্রয়—নিঃসহায়, কোথায় ধাই।

তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ ভীষণভাবে চলিতেছে। ভারতবর্ষ
হইতে বহু সংখ্যক শুক্রষাকারিণী নারী আহত সৈন্যদের সেবার জন্য

যুক্তিশ্রেণীতে গিয়াছে। সেই জন্য কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের হাসপাতাল গুলিতে নার্সের কাজ করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের আশ্রমে সংবাদ পত্র আসিত। আমি
বাংলা খবরের কাগজ হইতে পড়িয়া অন্যান্য মেয়েদের
শুনাইতাম—

রাজবালার মাথায় কি এক মতলব আসিল। সে একদিন আমাকে বলিল “আয় ভাই, আমরা নার্সের কাজ শিখি।” আমি
বলিলাম “আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা না করিলে ত হয় না।”
শ্রীযুত—দাস মহাশয় একদিন আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিলে
রাজবালা তাহাকে এই সকল বিষয়ে কথা বলিল। তিনি শুনিয়া
সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদিগকে প্রাথমিক কিছু শিক্ষা দিবার নিমিত্ত
একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। কালীদাসী লেখাপড়া জানিত
না। তাহাকে শিখাইয়া লইবার ভার আমার উপর পড়িল। তিনি
মাসের মধ্যেই সে খুব উন্নতি দেখাইল। মাঝে মাঝে আমাদিগকে
হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে আমরা ডাক্তার
নানাবিধ যন্ত্র ও ঔষধাদির নাম শিখিতাম।

গুপ্ত প্রণয়ীরা আমাদিগকে তখনও ছাড়ে নাই। তাহাদের
অত্যাচারে একেবারে অতির্ক্ষ হইয়া উঠিলাম। একটা মেয়ের উপর
একদিন পাশবিক অত্যাচারের উপক্রম করায় সে নিজেকে বাঁচাইবার
জন্য পাশের বাঁড়ীতে লাফাইয়া পড়ায় তাহার পা ভাঙিয়া যায়, এ জন্য
মোকদ্দমা ও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলাফল শুনি নাই। একদিন
সন্ধ্যার পরে আমি, রাজবালা, কালীদাসী ও আর একটী মেয়ে
(তাহার নাম এখন আমার মনে নাই—বোধ হয় খেঁদি বা এমন কিছু

হইবে) এই চারিজন একথানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া ঢালৌগঞ্জে আসিলাম। সেখান হইতে ট্রামে আমরা কর্ণওয়ালিস ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসভাজের উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটী আমার পরিচিত ছিল। বাল্যকালে পিতার সহিত এই উপাসনা মন্দিরে অনেকবার আসিয়াছি। আজ "মেই কথা মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিল। উপাসনা শেষ হইয়াছে। সমবেত উপাসকগণ প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের ব্রাহ্ম মহিলার মত কাপড় পড়া ছিল; পায়ে জুতাও ছিল, আমরা অগ্রসর হইয়া গেলাম।

ব্রাহ্ম সমাজে আসিবার যত্ত্ব আমরা অনেক দিন হইতেই করিতেছিলাম। রাজবালাই ইহার মূল কারণ। সে বলিয়াছিল ব্রাহ্ম সমাজ সকলকেই গ্রহণ করে, ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করিলে বিবাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু শেষে আমরা দেখিলাম, সেখানেও বাধা আছে।

সম্মুখে একজন পক-কেশ-শ্যাশ্ব বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ বৃক্ষকে দেখিয়া রাজবালা আমার কানে কানে বলিল “এই বুবি কৃষ্ণ কুমার মিত্র—প্রণাম কর।” আমরা চারি জনেই পাদপূর্ণ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া সকল কথা বলিলাম, এবং আমাদের রক্ষার উপায় করিতে অনুরোধ করিলাম। উদ্বার আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের দুর্ব্যবহার ও আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের অভিলাষ তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি বলিলেন “আপনাদের রক্ষার উপায় একাকী আমার দ্বারা

সম্মতিপূর্ণ হয় না। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণকে জিঞ্চাসা করাও প্রয়োজন।” তৎপরে তিনি একজন বৃক্ষ ভদ্রলোককে নিকটে ডাকিলেন। তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বলা হইলে তিনি বিশেষ ঘৃণার সহিত আপত্তি জানাইয়া কহিলেন—“না তা কিরূপে হয়? ইহাদের পূর্ববর্জীবন কল্পিত। আমার সমাজে কি পাপ প্রবেশ করিবে?” আমরা নিরাশ হইয়া চলিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার সময় পুনঃ প্রণাম করিতে গেলে শ্রীযুত কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন; কিন্তু অপর লোকটী, পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম হেরম্ব বাবু—‘না—না’ বলিয়া সরিয়া গেলেন। এই ভদ্র লোকটীর সহিত পরে আমার আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহা বলিলে তিনি দুঃখিত হইতে পারেন মনে করিয়া বলিলাম না।

আমরা ভাবিতে লাগিলাম এখন কোথায় যাই। উক্তার আশ্রমে আর আমাদিগকে নেবেনা। সেখানে ফিরিয়া যাওয়াও আমাদের ইচ্ছা ছিলনা। হঠাৎ আমার কমলার কথা মনে হইল। তাহার বাড়ীর ঠিকানা আমি জানিতাম। অন্ততঃ দুই একদিন সেখানে থাকিতে পারিব, এইরূপ ভরসা হইল। একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা চারিজনেই বাগবাজারে কমলার বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, কমলা তাহার মাতার সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা সে বাড়ীতে নাই। অগ্নলোক ভাড়াটে রহিয়াছে। তাহারা কমলাদের কোন সন্দান দিতে পারিল না; আমি যেন একেবারে বজ্রাহত হইলাম। দীর্ঘকাল পরে নানা দুঃখ ভোগের পর বাল্যকালের প্রিয়বন্ধু কমলাকে

দেখিব বলিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল—কিন্তু সে আংশা
যে একপভাবে বিনষ্ট হইবে, তাহা কথনও মনে করি নাই।
আমি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

‘মুকুলদার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলার সন্ধান
তাহার কাছে পাওয়া সন্তুষ্ট ছিল। আর কি উপায় আছে?
রাজবালা বলিল ‘ভাই আজ রাত্রির মত আমি তোমাদিগকে
একটা পরিচিত জায়গায় রাখিতে পারি। তারপর কাল সকালে
যাহা হয় করা যাইবে।’ আমরা অগত্যা সন্তুষ্ট হইলাম।
তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে।

সেই ঘোড়ার গাড়ীতে আরও বেশী ভাড়া দিয়া আমরা
চাঁপাতলায় হাড়কাটা গলিতে এক পতিতা নারীর গৃহে আশ্রয়
লইলাম। এই স্ত্রীলোকটী রাজবালার পূর্বব জীবনের পরিচিতা;
সে সমস্ত বাড়ীটা নিজে ভাড়া লইয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে
বেশ্যা ভাড়াতে বসাইয়াছিল। তাহাতে তাহার কিছু লাভ
হইত। এতদ্বিন্দু পাপ ব্যবসায়ে উপার্জন ছিল। এই প্রকার
স্ত্রীলোককে পতিতা নারী সমাজে ‘বাড়ীওয়ালী’ নামে অভিহিত
করা হয়। ইহাকে সকলে রাণী বাড়ীওয়ালী বলিয়া
ডাকিত।

রাজবালাকে অনেকদিন পরে পাইয়া, বিশেষতঃ তাহার
সঙ্গে আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বাড়ীওয়ালী অতিশয়
আনন্দিত হইল; সে পরম যত্নের সহিত আমাদের সকলকে
একটী ঘরে গাকিতে দিল, তাহাতে বিছানা পত্রেরও অভাব
ছিল না। আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থা ও হইল। রাজবালার
সহিত বাড়ীওয়ালী নানা কথাবার্তা বলিতে আবস্থ করিল।

দুশ্চিন্তায় আমার মনে শান্তি নাই। জীবনে এই প্রথম আমি
ব্যবসাদার খাঁটী বেশ্যার ঘরে প্রবেশ করি। আমার কেমন
একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। নীচের তলায় এক কোণে ঘর
—আলো বাতাস নাই। চারিদিকে একটা নৃতন রকমের
দুর্গন্ধ। কোথাও মাতালের বমি, কোথাও গান বাজনা—
কোথাও হৈ হৈ চীৎকার, কোথাও গালাগালি, ঝগড়া, এই সব
দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল; অথচ এখান হইতে
পলাইয়া কোথায় ঘাটিব তাহা জানিনা।

পরদিন সকালে খেদি বলিল, বেলিয়াঘাটায় তার এক
মাসীর বাড়ী আছে, সে সেখানে যাইবে। আমরা আপন্তি
করিলাম না! সে চলিয়া গেল। আমরা আরও তিন চারি
দিন সেই বাড়ীতে রহিলাম। ইতিমধ্যে বাড়ীওয়ালী আমাকে
ও কালীদাসীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বেশ্যারুপি অবলম্বন
করিতে যত লওয়াইল। সেই চতুরা নারীর সঙ্গে আমি তর্কে
পারিলাম না। সে যে সকল যুক্তি দেখাইল তাহার সার মর্ম
এই—বেশ্যারা স্বাধীন; ভগবান তাহাদিগকে রূপ দিয়াছেন—
পুরুষকে ভুলাইবার কৌশল দিয়াছেন কিসের জন্ম?—তাহা
দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতে। উকীল তাহার বুকি বিক্রয়
করে—পশ্চিত তাহার বিষ্ঠা বিক্রয় করে—এনন কি দীক্ষাণ্ডকুণ্ড
মন্ত্র বিক্রয় কারেন; তবে রূপবতী কেন দেহ বিক্রয় করিবে
না? বিপদ ভয় সকল ব্যবসায়েরই আছে। দেশের বড় বড়
লোক সমস্ত বেশ্যাদের পায়ে বাঁধা। ধনী লোকদের টাকা
বেশ্যাদের ঘরে উড়িয়া আসিয়া পরে। তাহাদের একটা
কটাক্ষের মূল্য সহস্র টাকা।

আমি ভুলিলাম। বাড়ীওয়ালী আমার জন্য ঘর দেখিতে লাগিল, কালীদাসী সেই বাড়ীতেই ঘর নিল। আমহাস্ট-ফ্রীটের উপরে যেখানে এখন সিটিকলেজের বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার নিকটে এক বস্তীতে আমি ও রাজবালা দুইখানি খোলার ঘর ভাড়া লইলাম। রাণী বাড়ীওয়ালী আমদের দুইজনকেই কিছু টাকা ধার দিয়া জিনিষপত্র ও কাপড়-চোপড় সমস্ত জোগার করিয়া দিল।

কুসঙ্গে কিরূপ অধঃপতন হয়, আর এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে পাইলাম। আমার কুলে পড়া বিচ্ছা সমস্ত ভুলিয়া যাইবার গতিক হইল। মুকুলদার কাছে কত নৃতন বিষয় শিখিয়াছিলাম—সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি এখন সব চাপা পড়িয়া গেল। আমি যাহাদের সঙ্গে ছিলাম তাহারা কেহ লেখাপড়ার চর্চা করিত না। কেবল কা'র কয়টা শোক জুটিয়াছে—কা'র প্রণয়ীর সঙ্গে কি আলাপ হইল—আর যত সব অশ্লীল ব্যাপার, ইহাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। তারপর নিজেদের রান্না ও ঘরের কাজ সমস্ত করিতে হইত। আমরা লজ্জায় বাজারে যাইতাম না। অন্য কাহাকেও দিয়া বাজার করাইতাম।

লম্পট প্রণয়ীকে পতিতা সমাজে ‘বাবু’ বলা হয়। এখন হইতে আমি এই শব্দটী মাঝে মাঝে ব্যবহার করিব। এই ‘বাবু’ লইয়া খুব গোলযোগ হইত। কোন পতিতার প্রণয়ী অন্য নারীর ঘরে প্রবেশ করিলে তাহা লইয়া তুমুল ঝগড়া বিবাদ বাধিয়া উঠিত। সকলেই তাহাতে যোগ দিত। আমিও বাদ যাইতাম না। আর যত রকমের অশ্লীল অশ্রাব্য কথা শুনিতে

শুনিতে আমার সহিয়া গিয়াছিল। বুঝিলাম স্কুলের পড়া
হইতে যে অল্পবিটা পাইয়াছি তাহা আমার অহঙ্কার বাড়াইয়া
সর্ববনাশ করিয়াছে—কিন্তু আমাকে পাপের আক্রমণ হইতে
বাঁচাইতে পারে নাই।

আমরাঙ্গসন্ধ্যার পরে সাজিয়া গুজিয়া আরতি দেখিবার ছলে
নিকটবর্তী ঠন্ঠনিয়া কালিবাড়ীতে যাইতাম। সেখানে কিছুক্ষণ
দাঢ়াইয়া যখন দেখিতাম আমরা কোন ভদ্রবেশধারীর নজরে
পড়িয়াছি, তখন বাড়ীর দিকে যাত্রা করিতাম। সেই ভদ্রবেশ-
ধারী ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গ লইত। এইরূপে শিকার ধরিবার
কৌশল রাণী ধাড়ীওয়ালী আমাদিগকে শিখাইয়াছিল।

আমি প্রথমে যাইতে আপত্তি করিতাম। আমার ভয় ছিল
যদি বাপের বাড়ীর কাছারও সঙ্গ দেখা হয়। যদি নন্দদাদা, সেই
হরিমতি কি, অথবা বাবার মোটর ড্রাইভার, এমন কি বাবা
নিজেই যদি দেখিয়া ফেলেন! রাজবালা আমাকে সাহস দিয়া
বলিল “তোমাদের বাড়ী এ পাড়ায় নয়—সেত এখান হইতে
অনেক দূরে; কলিকাতার মত সহরে কে কার খবর নেয়।
এ পাড়ার লোক ও পাড়ায় যায় না।” আমিও বুঝিলাম তাহাই;
অবশ্যে’ আমি সাবধানে রাজবালার সহিত বাহিরে যাইতাম।
আমার আর একটা আশা ছিল, যদি মুকুলদাকে কখনও রাস্তায়
দেখি। কারণ আমার মনে পরে তাঁহার বাড়ী এ পাড়াতেই
ছিল।

• একদিন শীতের রাত্রিতে ঠন্ঠনিয়া কালিবাড়ী হইতে
ফিরিবার সময় দেখিলাম] একজন ভদ্রলোক মাথায় র্যাপার
জড়াইয়া আমাদের পিছু পিছু আসিতেছেন। আমাদের বাড়ী

পর্যন্ত আসিয়া তিনি রাজবালার ঘরে গেলেন। পরদিন রাজবালা
আমাকে ডাকিয়া বলিল কাল রাত্রিতে যে লোকটী আমার
ঘরে এসেছিল তিনি কে জানিস्?—বৈষ্ণবখানার বাজারের কাছে
কি একটা কলেজ আছে সেই কলেজের তিনি বড় প্রফেসার,
তাঁহার নাম শ্রী.....। তিনি আরও দুই তিন দিন আমার
ঘরে এসেছিলেন।” আমিত নাম শুনিয়া অবাক। এর কথা
মুকুলদার মুখে কতবার শুনিয়াছি। ইনি খুব ভাল পড়ান।
আমি ভাবিলাম এই প্রফেসারের নিকট হইতে মুকুলদার কোন থবর
পাওয়া যায় কিনা দেখিব।

রাণী বাড়ীওয়ালী আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিত;
আমরা তাহকে রাণীমাসী বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে আমার ভয়
দূরে গেল। আমি দেখিলাম অন্য সকল স্ত্রীলোক আবোদ-
প্রমোদে মন্ত্র গাকে—নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করে—গঙ্গাস্নান,
কালীঘাটে, যেখানে সেখানে নির্ভয়ে যায়। তাহার আমাকে
বুঝাইল এখন আর ভয় করিস কাকে? গবণ্মেণ্টের কাছে
যখন একবার নাম রেজেষ্টারী করিয়েছিস—যখন একবার
বলেছিস যে স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি নিয়েছি, তখন আর কে
তোকে কি বলবে? নাচতে নেমে লজ্জা করলে চলবে কেন?

রাণীমাসী বলিল তোমার পিতা যখন মনে করেন তুমি
মরিয়াছ, তিনি যখন তোমার আর ঘরে নিবেন না, তুমিও তাঁর
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কচ্ছনা, তবে আর পিতাকেই বা ভয়
কিসের? আমি বলিলাম, তবু পিতা যদি দেখেন তাঁর কণ্ঠা তাঁর
সম্মুখে পাপ ব্যবসা করছে, তাঁর মনে দুঃখ হয় না?” রাণীমাসী
কহিল, তিনি কণ্ঠাকে ঘরে নিয়া অনায়াসে সেই দুঃখ থেকে

ধৰ্ম্মপেতে পারেন। মা, এ পথে যখন এসেছ, তখন অনেক নৃতন চিত্র তোমার চোখে পরবে। দেখবে সত্যই পিতার সম্মুখে কল্পা বেশ্যাবৃত্তি করছে—দেখবে সত্যই গর্ভধারিণী মাতা আপন কল্পাকে বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্য নিত্য সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছে— দেখবে সুত্যই ভাতা, ভগ্নী, আত্মীয়স্মজন বেশ্যার উপার্জিত অর্থে আত্মপোষণ করছে। পিতা! শুধু আমরা নই—প্রায় সমস্ত সমাজই অধঃপত্তি হয়েছে।”

আমি ও রাজবালা কোন উত্তর না দিয়া নীরবে শুনিতেছিলাম। রাণী-মাসী পুনরায় বলিতে লাগিল, “মানী, কোন দিন হয়ত দেখবে তোমার নন্দদাদাই তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছে। তোমার মুকুলদাও আস্তে পারে। মনে কিছু করো না মা, আমি স্বরূপ কথা বুলছি, কোন দিন হয়ত আমার ঘরেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে।

আমি লজ্জায় জিভ কাটিলাম। রাজবালা মাথা নৌচু করিল, রাণীমাসী বলিতে লাগিল, “আর কি বলব মা, সে দিন যে একটি স্ত্রীলোক রামবাগান থেকে আমার বাড়ীতে এসেছিল, তাকেত তোমরা দেখেছে। তার ইতিহাস শুনবে? তার পিতা.....উট্টীচার্যা; কলিকাতার কোন কলেজের খুব বড় অধ্যাপকের কাজ করতেন। বেশী বয়সে কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন রামবাগানে আপন রঞ্জিতার গর্ভজাত কল্পার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসত্ত্ব হয়ে শেষকালটা কাটাচ্ছেন—এই ত অবস্থা। আমি অনেক দেখেছি অনেক শুনেছি, তোমরাও দেখবে।

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সেই বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোকের

ঘরে একদিন দেখি সে একদিন একটা ছবিকে ফুলের মালা দিয়া
সাজাইতেছে। স্বীলোকটীর বয়স কিছু বেশী—সৌন্দর্য তখনও
রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ছবিখানি কার? সেই
স্বীলোকটী বলিল, উহা শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি। তিনি আমা
সমাজের একজন প্রধান আচার্য ছিলেন। আমি বিশ্বিত হইয়া
বলিলাম “ওহো—সেই শিবনাথ শাস্ত্রী, যাঁর ‘নিমাই সন্নাস’ কবিতা
আমরা স্ফূলে কত মুখস্থ করেছি—না—”

আজ শচীমাতা কেন চমকিলে,
যুমাতে যুমাতে উঠিয়া বসিলে ?
লুট্টিত অঞ্চলে ‘নিমু’ ‘নিমু’ বলে “
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে ?—

বাবার মুখেও এঁর নাম মাঝে মাঝে শুন্তাম। তার পর আমি
জিজ্ঞাসা করিলাম, “শিবনাথ শাস্ত্রীর ছবি তুমি তোমার ঘরে
রেখেছ কেন?” সে বলিল “আমি যখন ১৭/১৮ বৎসরের মেয়ে
তখন এক প্রৌঢ়া পতিতা নারী আমাকে আশ্রয় দেয়। তাহার
ছোট দুইটী ছেলে ছিল। তাহার প্রণয়ী বাবু তাহাকে একখানি
বাড়ী দান করেন। রূপ-ঘোবন বিক্রয় লক্ষ অর্থে আত্মপরিপোষণ
কর্বার জন্মই সেই স্বীলোকটি আমায় এনেছিল। সে চাঁপাতলার
কোন ছুতারের মেয়ে, ৭ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর
মহাশয় ও শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার পুনঃ বিধৃত দিতে
চেয়েছিলেন। নানা কারণে তাহা হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রীকে সে
বাল্যকালে দাদা বলে ডাক্ত। অবশেষে ঘটনা চক্রে সে বেশ্যাবৃন্তি
অবলম্বন করল। আমি তাহার আশ্রয়ে আস্বার পর একদিন শিবনাথ

শাস্ত্রী সেই বাড়ীতে আসেন এবং তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ কর্বার জন্য অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সেই শ্রীলোকটীর হন্দয়ে অনুত্তপ্ত জন্মে। তখন আমি তাহার বাড়ীতে ছিলাম। আমি তাহাকে মা বলে ডাক্তাব। সে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই ছবিখানা তখন কিনে আনে। প্রতিদিন সে ইহাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। মর্বার সময়ে সে আমাকে এই ছবিখানা দিয়ে গেছে এবং যত দিন বাঁচি এমনি করে ফুল দিয়ে সাজাতে বলেছে। তার মৃত্যুর পর সেই দুই ছেলে বাড়ী দখল নিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন এইভাবে আছি।”

আমি বলিলাম “শিবনাথ শাস্ত্রী এত বড় উদার-চরিত্র, পাপীকে উদ্ধার কর্বার জন্য বেশ্যালয়ে আস্তে যুগ বোধ করেন নি ?” শ্রীলোকটী ছবিখানিকে প্রণাম করিয়া বলিল, তিনি অনেক পতিতাকে সৎপথে এনেছেন। ঢাকার এক পতিতা নারীর কণ্ঠালক্ষ্মামণিকে তিনি উদ্ধার করে এক ব্রাহ্ম যুবকের সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন, সে গন্নও আমি শুনেছি।” আমি বলিলাম “আর এখন ব্রাহ্ম সমাজ কি হয়েছে ! আমরা সেদিন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ‘আশ্রয় নিতে গেলুম, তারা আমাদের নিলে না। হেরম্ব বাবু নামে একজন, (পরে শুনেছি তিনি হেরম্বচন্দ্ৰ মৈত্র) আমরা ‘পাপী বলে’ আমাদের প্রণাম পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না। বোধ হয় আজ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঁচে থাকলে আমাদের এ দশা হ'ত না।”

এই অস্বাস্থ্যকর খোলার ঘরে থাকিবার ফলে আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। রণী-মাসীর পরামর্শে গর্ভসঞ্চার

নিরোধ করিবার জন্য একটা ঔষধ খাইয়াছিলাম—তারপর হইতে আমার নানা রোগ দেখা দিল। রাজবালাও সেই ঔষধ খাইয়াছিল, কিন্তু তার কোন অসুস্থ হইল না। আমি অতিশয় শ্রদ্ধীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িলাম। সমস্ত শরীরে বেদন। হাত পায়ের তলায় বিশ্বি দাগ—মুখে গায়ে ফুস্কুরীর মত হইয়াঃ যন্ত্রণা-দায়ক ক্ষত উৎপন্ন হইল। রাণী-মাসী দেখিয়া বলিল, হাসপাতালে না গেলে আর রক্ষা নাই।

আমি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বিছানায় পড়িয়া দিবারাত্রি অবিরত কাঁদিতাম। চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইত। সেইবার রোগে ভুগিয়া বুঝিয়া ছিলাম, মরণে “বোধ হয় সুস্থ আছে। আজীয় বন্ধু কেহ নাই। বাড়ীর অন্য স্ত্রীলোক সকলে নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সকলকেই ব্যবসায়ের খাতিরে দরজায় দাঁড়াইতে হয়। তারপর সারা রাত্রি অনিদ্রায় মঠপানে অথবা নানা প্রকার উন্নেজনায় কাটাইয়া তাহারা বেলা ৮ টা ৯ টায় ঘূম হইতে উঠে। আমাকে কে দেখবে ? চারিদিকে একটা বিভৎস ব্যপার আমার চক্ষে পড়িল। আমরা যেন শৃঙ্খলার দল—কাদায় গড়াগড়ি দিতেছি। বুঝিলাম এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়।

রাণী-মাসী ও রাজবালা দুজনে মিলিয়া আমাকে হাসপাতালে দিয়া আসিল। তিন মাস পরে সুস্থ হইয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম। তখন আমার হাতে একটী পয়সাও নাই।

সপ্তম

সমাজ চিত্র

বৃন্দাবনে সেই মোহন্তজী আমায় বলিয়াছিলেন, “অন্নবন্দের দয়া তুমি অনেক পাবে।” তাহার কথাটী যে সত্য, এই প্রমাণ আমি জীবনে বার বার পাইয়াছি। দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন নহে—কিন্তু প্রবৃত্তির আক্রমণ হইতে কেহ বঁচাইতে পারে না। অধিকস্তু সেই রাক্ষসীর গ্রাসে ঠেলিয়া দিবার লোক অনেক আছে।

রাণী-মাসী এবার আমাকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে দোতলায় একখানা ভাল ঘর খালি হইয়াছিল। আমি তখন বুঝি নাই, এই প্রকার দয়ার কার্যাই, আমাদিগকে সর্ববন্ধুর পথে টানিয়া নেয়।

আমার যে বিষ্টা ছিল, তাহাতে আমি কাহারও বাড়ীতে ঢোক ছেলে মেয়েদের পড়াইতে পারিতাম, টেলিফোন আফিসে কাজ করিতে পারিতাম—নাসে'র কাজ করিতে—গান শিখাইতে পারিতাম, কিন্তু এই সকল সৎপথে অর্থ উপার্জন করিবার প্রবৃত্তি এবং স্বয়েগ কেহ আমাকে দেয় নাই। কেবল রূপর্যোবনের পসরা লইয়া বাজারে ঘুরিবার দুর্ঘতি রাণী-মাসী আমার হৃদয়ে আগাইয়া দিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, “রাণী-মাসী, আমার দেহকান্তি মলিন হয়েছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষণ, বিশুষ্ক। মাথার চুলের আর সে পূর্বের শোভা নাই। আমার দ্বারা এই পথে আর কি উপার্জন হবে ?” রাণী-মাসী আমাকে বুঝাইল; ““পতিতার রূপই প্রধান সম্পত্তি নহে। লম্পটেরা রূপ দেখিয়া মোহিত হয় না। দেখবে অতি কুরুপা বেশ্যা, সুন্দরীদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন কচ্ছে। এই জন্তে বলে যাব সঙ্গে যাব মজে মন।’ পুরুষ গুলি যখন সন্ধ্যাবেলা বেশ্যা পল্লীতে ঘুরে বেড়ায় - তখন কন্দপঠাকুর তাদের চোখে ধৰ্ধৰ্ধী লাগিয়ে দেন।”

রাণী-মাসী আমাকে কতক শুণ কোশল শিখাইল। কাপড় পড়িবার ফাশান, দাঁড়াবার ভঙ্গী, কথা বলিবার কায়দা, চলিবার রীতি, এসব কিরূপ হইলে লোক আকৃষ্ট হয় সে তাহা দেখাইয়া দিল। মনে দারুণ দুঃখ ও অপ্রাপ্তির কারণ থাকিলেও আগমন্তক পুরুষের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিতে হইবে। এমন ভালবাসা দেখাইবে—তাহা যে কপট, তাহা কেহ যেন ধরিতে না পারে। প্রণয়ী মঘপানাসন্ত হইলে তাহার মন রক্ষার জন্য কিরূপে মনের মাস ঠোটের কাছে ধরিয়া মঘপানের ভাণ করিতে হয় তাহা দেখিয়া লইলাম। লম্পটদের মধ্যে যে ব্যক্তি যে প্রকারের আমোদ চায় তাহাকে তাহাই দিতে হয়। এই প্রকার প্রতারণা শিক্ষা করিতে করিতে আমার বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে একটী নৃতন মানদাম স্থিত হইতেছে।

আমি ভাল গাহিতে পারিতাম। গলার স্বরও আমার কেশ সুমিষ্ট ছিল, একথা পূর্বে বলিয়াছি। এ বিদ্যাটী পতিতার জীবনে

খুব কাজে লাগে । রাণী মাসী অমেকে গান শিখাইবার জন্য একজন ভাল ওস্তাদ রাখিল । সে বলিল, “তোমার ব্রহ্ম সঙ্গীত অথবা স্বদেশী গান ত এখানে চলবে না । লপেটা, হিন্দি গজল অথবা উচ্চ অস্ত্রের খেয়াল ঠুংরা এসব হ'ল বেশ্যা মহলের রেওয়াজগ । কীর্তনও শিখিতে পার ।” আমি তিন চারি মাসের মধ্যেই সঙ্গীত শিক্ষায় উন্নতি দেখাইলাম । কীর্তন শিখিতে কিছু দেরী হইল ।

ছলনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লোক চিনিবার বিষ্ণো শিখিতে হইয়াছিল । কে চুরির মহলবে আসিয়াছে—কে কুৎসিত রোগাক্রান্ত—কে দুষ্ট প্রকৃতির লোক, কে ভালমনুষ ও সরলচিত্ত, এ সকল আমাদিগকে মুখ দেখিয়া ধরিতে হয় । অনেক সময়ে বিপদেও পড়িয়াছি । একদল লোক আছে, তাহারা বেশ্যা বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বেড়ায় । কখনও কখনও বেশ্যাকে হত্যাও করিয়া থাকে । এমনিভাবে প্রাণটী হাতে লইয়া পতিতা নারীকে ব্যবসা করিতে হয় । দু-পাঁচ টাকার জন্য কোন নারী একেবারে অপরিচিত পুরুষকে গ্রহণ করে—হয়ত সেই বিশ্বাসবাতক শ্রীলোকটীর বুকে ছুরি বুস্তাইয়া তাহার গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করিল । হতভাগিনী আর চক্ষু মেলিল না । পতিতারা পাপের শাস্তি এইন্দ্রপেও হাতে হাতে পায় ।

আমার ঘরে একটী ভদ্রলোক আসিতেন । তিনি কলিকাতার একজন ভাল চিকিৎসক । আজ পর্যন্ত তিনি নাকি বিবাহ করেন নাই । তাহার নিকট আমি অনেক উপকার পাইয়াছি । আমার শরীর যাহাতে শীত্র সারে, সেইজন্য তিনি খুব ভাল ভাল

গুষ্ঠি আমাকে দিয়াছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার অসাধারণ
বৈপুণ্য ছিল। তাঁহার মত একজন চিকিৎসককে এত বেশী টাকা
দর্শনী দিয়া আনান আমার পক্ষে অসন্তুষ্ট। তিনি যেদিন দুই
তিন ঘণ্টা আমার ঘরে বসিতেন, সে দিন আমাকে দশ বিশ টাকা
দিতেন। কখনও কখনও সন্ধ্যার পরে আমাকে মোটরে লইয়া
বেড়াইতে বাহির হইতেন—গ্রাম হোটেল, গঙ্গার ধারে অথবা
ইডেন গার্ডেনে বেড়াইয়া আমরা অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিতাম,
সেদিন আমি ৫০ টাকা পাইতাম। তাঁহার অনুগ্রহে আমার
মাসে প্রায় দুইশত টাকা উপার্জন হইত।

রাণী-মাসী আমাকে সাবধান করিয়া বলিল “মা, রোজগার বা
পার এইবেলা করে নাও। শেষ বয়সের কথা মনে রেখো।
এখন থেকে কিছু না জমাতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাবে;
দেখছে ত-এপথে বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই। একমাত্র টাকাই সব।”
আমি এই চিকিৎসক মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইয়া অন্তিমিকে রোজগারে
একটু টিলা দিয়াছিলাম। রাণীমাসী বুঝিয়াছিল, এই বাবু
চিরদিন থাকিবেন না। তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

সেই বৎসর আশ্বিন মাসে পূর্ববঙ্গে ভৌষণ ঝড় তুফান হয়।
তাহাতে বহুলোকের প্রাণনাশ ঘটে। লোকের ঘর বাড়ী, বাগান
শস্ত্রক্ষেত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাহাদের দুর্দশা মোচনের জন্য
কলিকাতায় এক সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন দাশ (উভয়েই এখন পরলোকে)
এই সংকার্যে অগ্রণী হ'ন। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র টাকা
সংগৃহীত হইতে থাকে। যুক্তেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া

ভিক্ষণ^১ করিং। বেশ্যা-পল্লীতেও তাহারা আসিত। আমরাও
সেই সাহায্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছি।

একদিন আমার সেই চিকিৎসক বাবু আমাকে বলিলেন “মানী,
.তোমারা পতিতা নারীরা মিলে যদি কিছু চাঁদা তুলে এ
ইষ্টবেঙ্গল স্থাইকোন ফণ্ডে পাঠাও, মিঃ সি, আর, দাশ তা’হলে
বিশেষ সন্তুষ্ট হ’বেন। তাঁর ইচ্ছা, এই সংকার্যের জন্য সমাজের
সকল স্তরেই সাড়া পড়ুক। কি বল—পারবে ?”

আলি বলিলাম—“দেখুন, আমি ত এ পথে নৃতন। সকলের
সঙ্গে চেনাশুনা নাই। আপনি ভরসা দিলে আমার যতদূর সাধ্য
করব।” তিনি বলিলেন, “রামবাগান, মোনাগাছি, ফুলবাগানে
আমর ‘জানাশুনা’ আরও কয়েকজন মেয়ে মানুষ আছে—
গিয়েটারের আভুনেত্রীদেরও এর মধ্যে আনা যায়।”

চিকিৎসক মহাশয়ের সঙ্গে নাকি মিঃ সি, আর, দাশের
পরিচয় ছিল, তাঁহার ও কতিপয় বন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতার বেশ্যা
পল্লী হইতে কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা উঠিল। জনসাধারণের কার্যে
এই আমার প্রথম ঘোগদান। এই স্থিয়োগে আমি মিঃ সি, আর,
দাশকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমরা যখন প্রণাম করিয়া
তাঁহার “পায়ে টাকার তোড়া রাখিলাম, তখন আনন্দাশ্রমতে
তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইল। তিনি আমাদের মন্ত্রক স্পর্শ করিয়া
আশীর্বাদ করিলেন। বুঝিলাম তিনি সতাই দেশবন্ধু।

রাজবালার সহিত একদিন দেখা করিতে গিয়া দেখি, তাহার
ঘরে খুব ভাল দামী আসবাব পত্র আসিয়াছে। একখানা পালক,
দেওয়াল আয়না, বুক্কেস্ এই সব জিনিষে ঘর সাজান

রহিয়াছে। বিছানার জন্য গদী তৈয়ার হইয়াছে। তাহার গায়ে
কিছু নৃতন গহনা ও দেখিলাম। রাণী-মাসীর টাকা সে পরিশোধ
করিয়াছে; তাহার নিজের হাতে কিছু নগদ টাকাও জমিয়াছে।
খোলার ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের এত অর্থ উপার্জন হয়, আমার
পূর্বে ধারণা ছিলম। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা, করিলে
রাজবালা কহিল ‘নানাপ্রকার লোক বেশ্যালয়ে আসে। যাহারা
ধনী জমিদারের ছেলে, তাহারা বন্ধুবন্ধুর লইয়া ‘প্রকাশ্যে বেশ্যাদের
নিকটে যায়। লোক-লজ্জা, ভয় ইহাদের নাই। ইহারা মন্ত্রপান,
গান-বাজনা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়। ছোটখাট খোলার
ঘরে ইহাদের পদার্পণ হয়ন। রামবাগান, সোনাগাছিই তাহাদের
প্রধান তীর্থক্ষেত্র। আর একদল লম্পট আছে, যাহারা সমাজের
নিম্নার ভয় করে—যাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া সম্মানিত,
তাহারা একাকী গোপনে বেশ্যাগৃহে আসে। কেবলমাত্র প্রবৃত্তির
তাড়নাই ইহাদের আসিবার কারণ। গান বাজনা, বা অপর
কোন আমোদ প্রমোদ ইহারা চাহেন। লুকাইয়া লুকাইয়া
ইহারা আসিয়া চলিয়া যায়—এদিকে লোক সমাজেও নিজেদের
মান মর্যাদা ও স্বনাম রক্ষা করে। কবি, সাহিত্যক, সমাজ
সংস্কারক, নামজাদা উকিল—স্কুলের মাস্টার, কলেজের প্রফেসর,—
রাজনীতিক নেতা, উপনেতা, গবণের্মণ্ট আফিসের বড় কর্মচারী,
ব্রাহ্ম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বিদ্যাভূষণ, তক্বাচীশ প্রভৃতি
উপাধিধারী অধ্যাপক, পুরোহিত, মোহন্ত, গুরুগিরি ব্যবসায়ী এই
সকল লোক এই শ্রেণীর। আমার ঘরে একজন হাইকোর্টের
বিধ্যাত উকিল আসেন। তিনি অতি উচ্চবংশীয় ভদ্র সন্তান।

ঠাহার নাম শ্বেতা.....। বয়স একটু বেশী। তিনি আমাকে অনেক টাকা দেন। আমি সেই বাবুকে একদিন ঠাট্টা করে' বলেছিলাম, "তুমি হাইকোটের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। আমার সেই কথা ফলে গেছে। তিনি সত্যসত্যই হাইকোটে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ইন। তিনি খুসী হ'য়ে আমায় এই সব জিনিষ পত্র কিনে দিয়েছেন। আমার এই দামী আংটীটা ঠাহারই উপহার।"

রাজবালার সহিত কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। আমি চলিয়া আসিব বলিয়া উঠিয়াছি এমন সময় একজন লোক রাজবালার ঘরে প্রবেশ করিল। রাজবালা সেই লোকটাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আমি বাহিরে আসিয়া অন্ধকৃত স্বরে রাজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?—একে ত ব্রাহ্মণ পাঁওতের মত দেখাচ্ছে।" রাজবালা বলিল "ইনি আমার এক বাবু। খুব বড় অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধায় উপাধিধারী পণ্ডিত। ইনি আজকাল আমায় নিয়ে খুব মজেছেন। তবে শুনেছি এর একটা দোষ আছ—নিত্য নৃতন চাই। বেশ্যা মহলে ইনি সুপরিচিত। খোলার ঘরেই এর যাত্যাত বেশী। আমি যতদূর পুরি ক'সে আদায় ক'রে নিছি—কি জানি আবার কোন্দিন সরে পড়বে।"

কিছুদিন পূর্বে কালীদাসী হাড়কাটা গলির বাড়ী ছাড়িয়া রামবাগানে উঠিয়া গিয়াছে। সে একজন ধনবান ভাটিয়া সওদাগরের নজরে পড়িয়াছিল। একদিন কালীদাসীর নৃতন বাড়ীতে যাইয়া দেখি তা'র অতুল ঐশ্বর্য হইয়াছে। তেলায় দু'খানি বৃহৎ ঘর—একখানি বসবার, একখানি শোবার। ইলেক্ট্রীকু

লাইট, পাথা, পালক, বুককেস্ট, বৃহৎ আয়না, ছবি, মার্বেল
পাথরের টেবিল, মেজেতে লিনোলিয়াম পাতা, শুভ্র ফরাস্
বিজ্ঞান কোমল তাকিয়ায় শোভিত—রূপার পানের থালা, এস্ট্রে।
কুন্ডনগরের সুন্দর মাটীর পুতুলে আলমারি সাজান। তিন সেট
জড়োয়া গহনা—হই সেট তোলা,—একসেট গায়ে। দানা
বেনোরসী সাড়ো ও ব্লাউজ তাহার বেড়াইবার পোষাক ; শান্তিপুর
ফরাসডাঙ্গার দেশো সাড়ো তাহার আটপৌরে কাপড়। তাহার
ভাটিয়া বাবু তাহাকে মাসিক ৩০০ টাকা নগদ দিত। এতদ্বারা ত
য়র ভাড়া ও খাওয়াপরার খরচ চালাইত।

কালীদাসীর এই সৌভাগ্য আলাদিনের প্রদৌপের মত তই
তিন মাসের মধ্যে হইয়াছে। আমি দেখিয়া একেবারে স্তন্ত্রিত
হইয়া গেলাম। কি উজ্জ্বল আশার আলোক আমি সম্মুখে
দেখিতে পাইলাম ! কোন সংযতান আমার অন্তরের মধ্যে বাদ বাদ
জাগিয়া বলিতে লাগিল, এমন সৌভাগ্য তোমারও হ'তে পারে ?
আমি সেই আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি কালীদাসী রূপসৌ ছিল। এখন ভালভাবে
থাকিবার ফলে তাহার সৌন্দর্য আরও ফুটিয়া বাহির হইল।
পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও কালীদাসী গান জানিত। আমি
তাকে কিছু শিখাইয়াছিলাম। এ বাড়াতে তাহার এক মঁ
জুটিয়াছে। কালীদাসী বলিল এই স্বীলোকটিই তাঙ্কাকে এই
ভাটিয়া বাবু ঘোগড় করিয়া দিয়া হাড়কাটা গলি হইতে
রামবাগানে আনিয়াছে। কালীদাসী আমাকেও এই পাড়াতে যাইতে
পরামর্শ দিল। আমি স্বয়েগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

রাণী-মাসীর পাওনা আমি প্রায় শেখ করিয়াছিলাম, আমার আর কোন ঝণ ছিলনা। ঘরের জিনিষপত্র চলনসহ রকম হইয়াছে। এই সময়ে আমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। তিনি ব্রাহ্মণ যুবক, কোন ব্যক্তের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রী.....পাধ্যায়। দুই তিন দিন আমার ঘরে আসিয়া তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আমার গানেই তাঁহাকে বিশেষ রূপে মুগ্ধ করিল।

তিনি আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন “আমি তোমাকে একটু উঁচু ষ্টাইলে রাখতে চাই। হাড়কাটা গলিটা অতি অভদ্রের যায়গা—এখানে যত ছেট লোকের আমদানী।” আমি মনে মনে কহিলাম “হায়রে বেশ্যার আবার ভদ্রাভদ্র বিচার—পতিতার উচ্চ নিচ স্তর বিভাগ—এদেরও জাতিভেদ !” এখনই অন্য স্থানে উঠিয়া গেলে আমার চিকিৎসক বাবুটিকে হারাইব এই ভাবিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলাম, “আমার দেনাপত্র আছে—বাড়িওয়ালীও কিছু টাকা পাবে, উঠতে হলে দু'চার মাস পরে উঠা যাবে।”

এই ব্যক্তের কর্মচারী মাঝে মাঝে আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে দুই একজন বন্ধুবান্ধবও আসিত। কেহ সমান্য পরিমাণে মদ খাইতেন। তবে নিত্যান্ত মাতাল কেহ ছিলেন না। আমি কখনও কখনও লুচি, পরোটা, মাছ, মাংস প্রভৃতি সুখন্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। এইরূপে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। আমার এই বাবুটীর খুব পান খাওয়া

অভ্যাস ছিল। সোনালী রূপালী তবক দেওয়া দামী পান সর্বদা তিনি খাইতেন। তিনি বড় সৌখীন পুরুষ ছিলেন। ব্যাক্সের বিশিষ্ট কর্মচারী বলিয়া তিনি একখানি সুন্দর বৃহৎ মোটর গাড়ী পাইয়াছিলেন। তাহাতে চড়িয়া তিনি আমার গৃহে আসিতেন। আমরা তাহার মোটরে অনেকবার বেড়াইয়াছি।

আমি কিছুদিন দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। আমার চিকিৎসক বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, তামি অন্য প্রণয়ীর হাতে পরিয়াছি। তিনি ক্রমশঃ কম আসিতে লাগিলেন। শেষে আসা একদম বন্ধ করিলেন। আমার পাধ্যায় বাবু সর্বদাই আমাকে এ পাড়া ছাড়িয়া যাইতে বলিতেন। আমার দেনাপত্র শোধ করিবার নাম করিয়া তাহার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা নগদ আদায় করিলাম। আর নৃতন বাড়ীতে যাইয়া বসিতে আরও অতিরিক্ত দুইশত টাকা লাগিবে, বলিলাম। তিনি সেই টাকাও দিলেন। আমি রামবাগানে কালীদাসীর বাড়ীর নিকটেই একটী বাড়ীতে দু'খানি ভাল ঘর ভাড়া লইলাম।

আমার সেই চিকিৎসক বাবুটি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি তখন পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই। পতিতার ব্যাবসায় প্রথম আরাণ্ড করিয়া আমি অবিবাহিত যুবকদিগকেই একটু বেশী পছন্দ করিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল গৃহে তাহাদের পত্নীর আকর্মণ না থাকাতে তাহারা পতিতার প্রতি বেশী আস্তি হইবে। কিন্তু এই দৌর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় আমার সেই আস্তি দূর হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, যাহারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে তাহারা নিজের রক্ষিতা নারীকেও ভালবাসে। অবিবাহিত যুবকেরা

প্রায়ই চপ্পল চিত্র এবং তাহারা কাহারও উপর নিজের মনকে
স্থিরভাবে বসাইতে পারে না।

আমার চিকিৎসক বাবুটী আমাকে ছাড়িয়া অনেক নারীর প্রতি
আসন্ত্র হইয়াছেন—সে সংবাদও আমি শুনিয়াছি। এমন কি
গৃহস্থের ঘরেও তিনি নাকি কেলেঙ্কারী ঘটাইয়াছেন। খবরের
কাগজে সেই ইঙ্গিত দিয়াছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

রামবাগানে আসিয়া আমার শুধে স্বচ্ছন্দে কাল কাটিতে
লাগিল। কিন্তু আমার একটা দুঃখ মাঝে মাঝে প্রাণে জাগিয়া
উঠিত। মুকুলদা অথবা কমলার কোন সংবাদ পাইতাম না। পিতা,
মাতুল বা বন্দদাদা ইহাদের দেখা পাইতে আমার ভয় হইত;
দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু কমলা মুকুল-দা এই দুই
জন ত আমার পাপ জীবনের গতির সূচনা জানে। স্বতরাং তাহা-
দের জন্য প্রাণ বাকুল হইত। পতিতার জীবন কিরূপ বিপদগ্রস্ত
তাহা এই অন্ত সময়েই আমি বুঝিয়াছি। আর সকলে আমায় ঘৃণা
করে করুক—পায়ে ঠেলিয়া ফেলে ফেলুক—মুকুল-দা ও কমলা
কখনও আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস আমার
দৃঢ় ছিল।

রামবাগানে আসিয়া আমি পড়াশুনায় মন দিলাম, বাবুকে
বলিয়া পুস্তক রাখিবার জন্য একটা আলমারী কিনিলাম। বাংলা
ইংরাজী সাহিত্য গ্রন্থাদি তাহাতে সাজাইলাম। বাবু আমার জ্ঞান-
পিপাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মাসিক সংবাদপত্র প্রবাসী ও
ভাৱতবর্ষ তিনি আমায় কিনিয়া দিতেন। দৈনিক খবরের কাগজ
তিনি আফিস হইতেই লইয়া আসিতেন। আমি তাহা পড়িতাম।

গানে, পড়াশুনায়, বাবুর ভালবাসায় আমার মন একপ্রকার সাময়িক স্থিরতা লাভ করিল।

এই সময়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আসিয়াছে—তাহার সহিত আমাদের পতিতা জীবনের নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কুলটার চরিত্র লইয়া বঙ্গিম চট্টোপাধ্যায় ও তাহার সমসাময়িক সাহিত্যকগণ যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কুলটার প্রতি ঘৃণার ভাবই বক্তুর হয়। কৃষ্ণ-কান্তের উইল, চন্দশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে কুলটার পরিণাম, ভৌষণ শাস্তি ও প্রায়শিচ্ছন্তি দেখিতে পাই। এতাবৎকাল পতিতা নারীর জীবনের এমন দিক দেখান হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া লোক পতিতার নারীর সংস্পর্শে ঘাটিতে ঘৃণা বোধ করে—লজ্জিত হয় ও ভয় পায়। অমৃতলাল বন্ধুর তরুবালা নাটকেও তাহাই দেখান হইয়াছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাহার কয়েকখনি উপন্যাসে কুলটার চরিত্রের অপর এক দিক দেখাইয়াছেন, যাহাতে তাহার প্রতি লোকের সহানুভূতি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, শরৎ চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ সেনগুপ্ত এবং বল তরুণ সাহিত্যিক তাহা খুলিয়া দিয়াছেন। তাহারা কুলটা ও পতিতা নারীর কোন কোন চরিত্র এমনভাবে দেখাইয়াছেন, যাহাতে লোক তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহারা বলেন “বেশ্যারা অসতী হইতে পারে—কিন্তু তাহারা মনুষ্যদের আদর্শে হীন নহে। পতিতা নারীও যখন সরল চিন্তা, ধর্ম প্রাণ, ঈশ্বরভক্তি, দয়ার্দি হৃদয়, নানশীল হইয়া থাকে, তখন তাহারা ঘৃণার পাত্র হইবে কেন? দোষ সমাজের,—পতিতার নহে।”

এই সকল উপন্যাস ও কথা-সাহিত্য তরুণ যুবক মুবতীদের প্রাণে এক অপূর্ব চঞ্চলতা জাগাইয়া তুলিল। তাহারা ‘শ্রীকান্তের’ ভ্রমণ কাহিনী’ পড়িয়া রাজলক্ষ্মীর মত পতিতা নারীর খোঁজ করিতে লাগিল,—শুভা পড়িয়া ‘শুভ সঙ্গিনীর’ মত অভিনেত্রীর সন্ধানে ০ বাহির হইল। ‘পরপারে’ নাটকের সরঘুকে পাঠিতে তাহারা পাগল হইল। আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি, বাঙ্গালার তরুণ যুবকের দল ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় কলুষ সংস্পর্শে আসিতেছে।

পতিতা নারীর জীবনের এই চিত্রকে নব্য সাহিত্যকের দল রিয়্যালিষ্টিক আর্টের অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।) এই আর্টের দোহাই দিয়া আজকাল সমাজের মধ্যে এক সর্ববনাশী বিষ ছড়ান হইতেছে। কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ নটের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন—সন্ত্রান্ত বংশীয় জমিদার পুত্র আপন স্ত্রী কন্যা লইয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সহস্র সহস্র দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় দেখাইতেছেন—পিতামাতা কন্যাদিগকে থিয়েটারের ষ্টেজে নাচিতে পাঠাইতেছেন। স্বামী স্বকর্ণে শুনিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী অভিনয় দেখাইতেছেন—পিতা দেখিতেছেন, কুমারী কন্যা রঙ্গমঞ্চে প্রেমের ছল। কলা শিখিতেছে। যিনি বিশ্বকবির উচ্চ আসন পাইয়াছেন, যাঁহার কাছে জগৎ মহৎ আদর্শের প্রত্যাশা করে, তিনি থিয়েটারে যাইয়া নটীদের গানের মহলা দেওয়াইতেছেন। যে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে দেশ উচ্চ শুনীতির আদর্শ পাইতে চায়, তাহারাও আর্টের নেশায় মজিয়াছে। রবীন্দ্র ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, লেডী অবলা বসু, শ্রীযুক্তা

কামিনী রায়, মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী, সরলা দেবী ইহাদের
মত লোকও ভদ্র ঘরের যুবতীদের ন্যূন্যের সমর্থন করেন।
ইহা লইয়া সাময়িক সংবাদ পত্রাদিতে বহু বাদ প্রতিবাদ হইয়া
গিয়াছে, আমি তাহা পাঠ করিয়াছি, আর জলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি।

আমার আত্মচরিত লিখিতে যাইয়া এত কথা বলিবার প্রয়োজন
এই যে, আমাদের মত পতিতা নারীর জীবন যে তাসংযম ও
অসাবধানতার ফল, তাহা সমাজের প্রায় 'সকল স্তরে প্রবেশ
করিতেছে। যাঁহারা সমাজের মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি
এইদিকে আকৃষ্ট হউক, ইহা আমার অভিপ্রায় ও নিবেদন।
যে অপরিনামদৰ্শী যুবকের কুহকে পড়িয়া আজ আমি পতিতা—
এই প্রকার রাণী চুনীর প্রেমিক ও এই সকল নাচগানের কর্ণধার
রূপে আছেন, তাহা কি অভিভাবকগণ খবর রাখেন ? নিজে
মজিয়াছে বটে কিন্তু সমাজকে মজিতে দেখিলে ছুঁথ হয়।
আমাদের চুনীর বাবু-শিল্পটি....'সম্মিলনীর' একজন বিশেষ
পৃষ্ঠপোষক। চুনীর নিকট এই সম্মিলনীর দুই একটা অপবাদ
শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা ঠিক না জানায় উল্লেখ করিলাম না।

নব্য সাহিত্যের এই রিয়ালিষ্টিক আর্টের ফল আরও একদিকে
দেখা দিল। পূর্বে পতিতা নারী সৎকার্যে অর্থদান করিতে 'চাহিলে
অনেকস্থলে তাহা গৃহীত হইত না। এমন কি মফস্বলের ভূম্যাদি-
কারী পতিতার নিকট হইতে ভূমির করও নাকি গ্রহণ করিতেন
না। ক্রমশঃ এই ভাব দূর হইতে লাগিল। এ বিষয়ে দেশবন্ধু
চিত্তরঞ্জন অতি উদার হৃদয় ছিলেন। জন সাধারণের হিতকর
কার্যে তিনি শুধু পতিতার দান গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না—

পতিতাদিগকে তিনি দেশ-হিতকর কার্যে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু আমাদের মত নীচ দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। ১১৯৮ সালের পর হইতে তাহার হস্তে ক্রমশঃ দেশের নেতৃত্ব ভার আসিতে থাকে। এ দিকে নব্য সাহিত্যও পতিতাদিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল। স্মৃতরাং আমরা প্রকাশ্যে ভদ্র সমাজে মিশিবার একটা সুযোগ পাইলাম। ইহার ফল কি হইল? তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

জন সাধারণের হিতসাধন সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভূত্বে যোগদান করিবার বিষয় বলিবার পূর্বে আমার জীবনের আর দুই একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়। এই অধ্যায় শেষ করিতেছি।

আমাদের বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক একখানি ঘর ভাড়া লইল। সে সাত মাসের অন্তঃসন্ধা ছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা অবগত হইলাম। এই স্ত্রীলোকটী দরিদ্র কায়স্থ ঘরের বিধিবা। তাহার গুরু শ্রী.....বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সর্বনাশ করিয়াছেন। তিনি এখন আর কাছে যেসেন না। স্ত্রীলোকটী কলঙ্কের ভয়ে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বেশ্যা পল্লীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ এই স্থান সকল কলঙ্ক ও পাপের ভাণ্ডার। আমি এই হতভাগিনীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমার পরামর্শে স্ত্রীলোকটী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিল। সোভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় আসিলেন। আমি নানা ছলে তাহার সহিত পরিচয় করিলাম।

এ বিষয়ে আমার বাস্কের বাবুটীর নিকট প্রয়োজন মত উপদেশ -লইয়াছি। একদিন আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিয়া বলিলাম, “দেখুন, এ বেচারী এখন দুঃসময়ে পড়েছে—আপনি যদি পরিত্যাগ করেন, এর উপায় কি হবে ? কিন্তু তিনি আমার কথা উপেক্ষা করিলেন। তখন আমি উত্তেজিত কর্ণে বলিলাম “মহাশয়, আমরা পতিতা নারী—আপনাদের ঘূণিতা, আর আপনি সমাজের কর্তা, আজ আমার কাছ থেকে আপনি তিরঙ্কার শুনে যেতে চান কি ? ছিঃ, ছিঃ, আপনার লজ্জা হয় না ? গুরুগিরি করতে গিয়ে সংয়ল সন্দয় বিধবা শিম্যানীর সতীত্ব নষ্ট করেছেন, দরিদ্রকে কলঙ্কে ডুবিয়েছেন। আপনি না শুনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আপনি না অধ্যাপনা করে গান্ধেন ? আপনার পাণ্ডিত্যে ধিক—আপনার শাস্ত্র জ্ঞানে শত ধিক। আমরা মহাপাপা বারবণিতা, আমবা নরকে যাব, ঈশ্বা সত্তা—আপনারা নরকে যাবেন না কেন জানেন ?—আপনাদের জন্য এত বড় নরক কুণ্ড এখনও তৈরী হয়নি।” আমার কথা শুনিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় চৃপ করিয়া রহিলেন। আমি না গামিয়া,— তাঁর মুখের কাছে তর্জনি হেলাইয়া ক্রুদ্ধসরে বলিলাম, “আপনি যেতে চান চলে যান। কিন্তু জানবেন আমি একে দিয়ে আদালতে নালিশ করে আপনার কাছ থেকে খোরপোয় আদায় করে ছাড়ব। জানি, আপনি অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু আমরা এই বাড়ীর সকলে সাক্ষা দিব যে আপনি এর ঘরে আস্তেন, এবং আপনার দ্বারা এর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। আমরাতো কতই মিথ্যা বলি— যাতে একজন নির্দেশ নারীর উপকার

হয়—যাতে এক শর্ঠ লম্পটের শাস্তি হয়, সেইরূপ মিথ্যা বলতে আমাদের জিহ্বায় আটকাবেন।

বিষ্ণাভূষণ মহাশয় বিশেষ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন, বুঝিলাম—তিনি তয় পাইয়াছেন। কয়েক দিন পরে তিনি আসিয়া আমার হাতে একশত টাকা দিয়া বলিলেন “এর জন্য যা কিছু খরচ প্রয়োজন হয়, এই টাকা থেকে ক'র'বে”। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম এবং স্বীলোকটার প্রয়োজনীর জিনিষ-পত্র যোগাড় করিয়া দিলাম। যথাসময়ে ইহার প্রসব হইল। বিষ্ণাভূষণ মহাশয় প্রসূতি ও সন্তানকে আমাদের বাড়া হইতে সরাইয়া নিলেন। তারপর খবর^১ লইয়া জানিয়াছিলাম, তিনি বিধবাটীকে বিশেষ অর্থ সাহায্য করেন নাই। এই লোকটার দুর্চরিতার কথা অনেকেই জানিত। আরও কয়েকটী শিশ্যানীর সর্ববনাশ তিনি করিয়াছিলেন। তামি তাহার চাকুরীস্থলে বেনামী চিঠিতে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলাম। এমন সর্ববনেশে লোকের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। পরে শুনিয়াছিলাম, তাহার ভাল ভাল চাকুরী সব গিয়েছে। সংবাদ পাইলাম, তিনি নাকি বৃক্ষ বয়সে এক ষোড়শী বালীর পানি গ্রহণ করিয়া তাহার অন্তরের ঘোবন ক্ষুধা মিটাইতে হেন। সমাজের যে অংশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহার এমন গলিত ক্ষত দেখিয়া, পতিতাদেরও ধূনায় নাক সিটকাইতে হয়।

আমারদের বাড়ীর নিকটে সুশৌলা নামী এক বারবন্দিতা বাস করিত। সে এক নবাবের রক্ষিত। তার বিপুল সম্পত্তি, অতুল উশ্যায়। উহা আর বণ্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নবাব বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহার রাজধানীতে বিরাট প্রাসাদ

মিশ্রণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তিনি থাকেন না। 'রাজধানী
ছাড়িয়া কলিকাতায় এই রক্ষিতা বারনারীর নিকটেই অবস্থান
করেন'। এদিকে তাঁর সোনার পুরী শিয়াল কুঙুরের আবাস
স্থল হইতেছে, প্রজাগণের দুর্দশার একশেষ—স্বব্যবস্থা ও শাসনের
অভাবে খাণের পরিমাণ দিন দিন বাঢ়িতেছে। গরীব প্রজার রক্ত
শোষণ করিয়া তাহা নটীর পূজায় ব্যয় করিতেছেন। নবাব বাদসার
মত লোক পাতিতার প্রেমে মজিবে, ইহাতে 'নৃতন্ত্র নাই। তবে
এ কথা এখানে উল্লেখ করিলাম কেন! তাহার কারণ আছে;
সুশীলার ঘরে যাইয়া প্রায়ই দেখিতাম নবাবের রাজধানী হইতে
বহুমূল্য আসবাব পত্র, ছবি, পর্দা, হীরা, জহরৎ, আয়না, গজদণ্ডের
কারুকার্য-খচিত দ্রব্য'— এ সমস্ত আসিতেছে। ইহার কোন কোনটি
বিক্রয় করা হইত—কোনটি বা সুশীলার ঘরেই শেঁতা পাইত।
এই সকল দ্রব্য নবাবের পূর্ব-পুরুষগণের কীর্তি চিহ্ন স্বরূপ রাজ-
ধানীর পুরাতন প্রাসাদে সজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিক কৌতি-
দর্শনার্থীরা তাহা দেখিয়া অর্তীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
করিত। একটা তুচ্ছ বেণ্যার মনস্তুষ্টির জন্য এই কৌতিলিচিহ্ন সমূহ
কি মুখের মত ধূঃস করা হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমি দুঃখ
করিতাম। যাহারা পূর্বপুরুষের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা
পরাধীন হইবেন। ত হইবে কে ?

সুশীলার বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ী কৃয় করা হইয়াছে।
সুশীলা নবাবের প্রধান বেগমের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্য—অধিক
আদর যত্নে আছে। নবাব খণ করিয়া, মনি-মুক্তাদি বন্ধক রাখিয়া
সুশীলার একহাজার টাকা মাসোহারা জোগাইতেছেন। খাণের

দায়ে নবাব বাহাদুর মামলাতে জড়িত হইয়া কাঠগড়ায়ও দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; শৈলশৃঙ্গে বজ্রাঘাত পড়িল ।

আমি পতিতা নারী হইলেও রাজনৈতিক সংবাদ লইয়া থাকি । আজকাল যাঁহারা স্বাধীনতার কথা তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, এদেশের নবাব বাদসার বংশধরেরা যদি স্বাধীনতার প্রিয়স্মৃতিচক্ষ সমূহ এমনি নির্মম হন্দয়ে পতিতার কলুষিত প্রেমানল শিখায় আহতি দেয়, যদি পূর্বপুরুষের হাতের জিনিসের চেয়ে, বেশ্টার বিলোল কটাক্ষের মূল্য বেশী হয়, তবে স্বাধীনতার আশা কোথায় ? অপবিত্র ত্বাবর্জনার স্তপে স্বাধীনতার বিশাল বেধিক্রমের জন্ম হয়না ।

— — —

অষ্টম

অশ্বি ক্রীড়া

— ১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয় । বাংলাদেশে উহার পরিচালন ভার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গ্রহণ করেন । ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িবে—উকিল-ব্যারিষ্টার আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবেন, কেহ কাউন্সিলে যাইবে না—গবণ মেঝের উপাধি বর্জন করা হইবে—ফৰ্দেশা দ্রব্য কেহ কিনিবে না ; এই পাঁচরকমের বয়কট সেই অসহযোগ নীতির মূল মন্ত্র ছিল । ইহার প্রচারের জন্য সমস্ত দেশে, গ্রামে গ্রামে

নগরে নগরে সভা সমিতি বক্তৃতা, পিকেটিং অর্থাৎ 'বিরোধকারী' দিকে বাধা দেওয়া চলিতে লাগিল, যুবকেরা স্বেচ্ছা-সেবকদল গঠন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ল। কর্মী চাই—কর্মী চাই এই রব উঠিল।

ভদ্র-মহিলাগণও পুরুষের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীণ হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহধর্শিণী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তাহাদের নেতৃত্বে পদ গ্রহণ করিলেন। তাহারা সহধর্মী মহিলাদের মধ্যে উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, সন্তোষ কুমারী দাশগুপ্তা, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদার, বগলা সোম, উমা দেবী, ইহাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পল্লাগাম ও মফঃস্বল হইতেও বহু-সংখ্যক মহিলা কর্মী আসিতে লাগিল। সে কি উৎসাহ—কি উদ্দীপনা, কি এক অপূর্ব কর্ম চক্ষলতা দেখিয়াছিলাম! এইসকল মহিলা কর্মীদিগকে সংঘবন্ধ করিবার নিমিত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নারী-কর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সম্বন্ধে পরে বলিব।

পুলিশ চারিদিকে খুব ধর-পাকড় আরম্ভ করিল। মহিলা কর্মীরা ও পুলিশের হাতে নিষ্ঠার পান নাই। আমরা কয়েকজন পতিতা নারী মিলিয়া একটা ছোট দল গঠন করিলাম। আমাদের বাবুগণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিতেন। ইতিপূর্বে ইঁটবেঙ্গল সাইক্লোন ফণের জন্য চাঁদা তুলিতে যাইয়া আমরা বাহি'র ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহস, চতুরতা ও দক্ষতা বাড়িয়াছিল। অনেক ছোট বড় দেশনেতার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। এবার যখন আমরা পুনরায় কার্যক্ষেত্রে নামিলাম, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

সহকৰ্মীয়ের অতিশয় সুখী হইলেন এবং আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিলেন।

এই অসহযোগ আন্দোলনের উৎজেনা এত তীব্র ও প্রবল হইয়া উঠিল যে, একসঙ্গে সকলে কাজ করিবার সময় 'মনে থাকিতনা যে, আমরা অস্পত্য ঘৃণিত বেশ্যা—আব ইঁহারা সম্মানিত ভদ্র গৃহস্থ যুবক। সেই কর্মী যুবকেরাও ভুলিয়া যাইত যে তাহারা বারবনিতার সহিত ঢাঙফেরা করিতেছে। যে সকল পবিত্র-চরিত্র ব্যক্তি কখনও বেশ্যালয়ে আসেন নাই বা আসিবার কল্পনা করেন নাই, তাহাদের সঙ্গে আমরা এই অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া এক ঘোটৰ গাড়ীতে বেড়াইয়াছি, হাস্ত পরিহাসের সহিত তাহাদের সঙ্গে কথা ও বলিয়াছি। সকলে আমাদের স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করিতেন—গর্বের আনন্দে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিত।

একদিন কর্মশেষে গৃহে ফিরিবার পূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইবার সময় তাহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্নেহভরে আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেইস্থানে বসিয়াছিলেন। আর কেহ ছিলেন না। আমরা যে কুরবনিতার দল, তাহা তিনি বুঝিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে তিনি প্রশ্ন করিলেন “শেষ কালে এরা ও এসে কাজে নেমেছে—এটা কি ভাজ হচ্ছে মি? দাঁশ ?” চিত্তরঞ্জন শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন “আপনারা হ'লেন রুচিবাগীশের দল। আমার সঙ্গে আপনাদের মিলবে না। সংজীবনী-সম্পাদক কেষ্ট মিল্যুরের কাছে যান। তিনি আপনাদের মনের মত লোক। কেশব সেনের সঙ্গীণতা থেকে মুক্ত হ'য়ে উদার মত অবলম্বন করবার জন্য সাধারণ-আক্-

সমাজের স্থল ; কিন্তু শেষে উহারই মধ্যেও ক্ষুদ্রতা দেখা দিল। কৃপের মত এতটুকু হলে হবে না—সমুদ্রের মত প্রশংসন বিশাখা হ'য়ে সকলকে গ্রহণ করা চাই। পাশ্চাত্য দেশে কি দেখছেন ? আমাদেরও তাই করতে হবে। যাদের ঘৃণায় দূরে ঠেলে রেখেছি, তারাই আজ এগিয়ে আসছে। এ শুভলক্ষণ, আমি আস্তকুঁড়ের আবর্জনায় এক অপূর্ব শক্তির স্বাক্ষর পেয়েছি।”

আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার ওর্ক বিতর্ক কর্তৃর চলিয়াছিল নানি না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমরা দেশবন্ধুর আশা পূণ্য করিতে পারি নাই। আমরা সেই মহাপুরুষের স্মৃথের স্বপ্ন ভাসিয়া দিয়াছি। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দেশ সেবার অনলে আমাদের সকল পাপ দফ্ন হইয়া যাইবে। তাহা হইল না। দেশকর্মীদের সহিত বারবনিতাদের এই প্রকার অবাধ মেলা-মেশাৰ ফল ভাল হইল না।

আগ্নম লইয়া খেলা বড় বিপজ্জনক। সকলে তাহা পারে না। আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে আনিয়া দেশ-নায়ক গণ ভুল করিয়াছিলেন। সৎকার্যের অনুসন্ধানে একটা পতিরোচন ভিত্তির প্রয়োজন। আমাদের তাহা ছিল না। আমরা শুন্দিচ্ছিত ও সংযত না হইয়াই একটী শুন্দি-তর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, ঈক্ষণ্যপরতা এই সব হইল বারবনিতাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। দেশের কার্য্যে ব্রহ্ম হইলেও আমাদের এই সকল দুষ্প্রবৃত্তি আমাদিগকে পরিচালিত করিল। স্মৃতরাং কথায় যে বলে “শিক্ষণাড়তে বানৱ”—আমাদেরও হইল তাহাই।

যে সকল কস্তুরী যুবকের চরিত্র-বল এমন ছিল যে একটা সিগারেট পর্যন্ত কখনও খায় নাই, তাহারা কেহ কেহ এই অসহযোগ

আন্দোলনের ক্ষমক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া মঘ-পান পর্যন্ত শিখিয়াছে। যে সকল যুবক এমন পৰিত্ব চিন্ত ছিল যে স্বীলোকের সহিত কথা কহিবার সময় মাথা তুলিত না—তাহারা আমাদের সংসর্গে আসিয়া এখন বেশ্যা দূরে থাক, বুলবধূর সহিত নিল্লজ্জের মত কুৎসিত হাস্য পরিহাস করিতে অনেকে লজ্জিত হয় না। পতিতানারীদের একটা প্রধান স্বভাব এই যে তাহারা সচরিত্র ও সংযত-চিত্ত পুরুষ দেখিলে তাহাকে হস্তগত করিতে বিশেষ চেষ্টা করে এবং তাহার সংযম ও পৰিত্বাকে বিনষ্ট করা একটা বীরহৃর কার্য বলিয়া মনে করে।

আমি জানি, আমরা যে কয়জন এই অসহযোগ আন্দোলনের কার্য করিতে গিয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকে অনেক দেশকম্মী যুবক দিগকে প্রলুক কৃরিয়াছিল। আমিও সেই অপরাধ হইতে মুক্ত নহি। এমন কি কেহ কেহ পিতৃতুল্য দেশবন্ধু চিন্তরণনের পারিষদদিগের প্রতিও কটক্ষ হানিতে ছাড়ে নাই। বাড়ীতে ফিরিয়া আমরা এই আলোচনাই করিতাম,—কে কয়টা নৃতন ‘বাবু’ জুটাইয়াছে—কার ঘরে কোন দেশকম্মী আসিলেন—পঁরের টাকায় কেমন পান সিগারেট খাওয়া হইল—মোটর চড়া গেল—টাঙ্গী ভাঁড়ার টাকা হইতে কে কত টাকা অঁচলে বাঁধিয়াছে, ইতাদি।

আমার যে শুধু যুবকদের অধঃপাতে লইয়া গিয়াছি, তাহা নহে। গৃহস্থ ঘরের কঁশ্যা ও বধূরাও আন্দোলনে যোগ দিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। অবশ্য উহারা উদার, শিক্ষিত পরিবারেরই বৌঝি। সাধারণতঃ গেঁড়া হিন্দুরা তাহাদের অন্তঃপুরের স্বীলোকদিগকে এ-ভাবে বাহিরে যাইতে দেন না। গৃহস্থ ঘরের যে সকল মহিলা

আমাদের সহিত কার্য করিতেন তাঁহাদের কাহারও সহিত নান' কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলাপ হইত। আমি জানি, কয়েকটী ভদ্র গৃহস্থের বধু অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের স্বামীর নিকট ফিরিয়া যান নাই। কেহ কোন কার্য আরম্ভ করিয়াছেন—কেহ বা কোন দেশকর্মীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছেন। এই সকল দেশকর্মীর আচরণ সকল লোকই জানে, অথচ তাঁহারা ভেট দিয়া এই প্রকার সাধু-বেশী লম্পট স্বভাব ব্যক্তিদিগকেই কর্পোরেশন, কাউন্সিলে প্রেরণ করে। সমাজের অঙ্গতা এতদূর গভীর।

এই সম্পর্কে একটী কথা বলিতেছি। মহঃস্বলের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ যুবকের স্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনে মহিলা কর্মীদের সহিত কার্য করিতে আসিয়াছিলেন, এই বধুটী পরমামুন্দরী—আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার একদিন কথাবার্তাও হইয়াছে। এহ পুস্তকখানি যনি কখনও তাঁহার হাতে পরে, তবে তিনি হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবেন। তাঁহার সহিত আমার অন্ন পরিচয়েই একটু বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতে বাধা হইয়াছি^{***} বলিয়া আমি তাঁহার নিকট ক্রম চাহিতেছি। তিনি যে অধঃপাতে গিয়াছেন, তার জন্য অংশতঃ কে দায়ী, তাহা আমি জানি।

আমার মনে আছে, আমি ব্রাহ্মণ কুলবধুটীর সহিত একটু অন্তরঙ্গভাবে নানা ভাবের আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি এক দেশকর্মী কায়স্ত যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়া-

ছেন। এই যুবকটী উচ্চ শিক্ষিত আকুমার অঙ্গাচারী ছিলেন। আমি প্রথমে একটু আশচর্য হইলাম। কারণ, আমার এমন সুন্দরী যুবতী বৃন্দুটী যে শেষকালে একটা বাঙাল যুবকের প্রেমে মজিবে তাহা ভাবি নাই। একবার এই ব্রাহ্মণ বধূটী অপর কতিপয় মহিলাকস্মীর সহিত প্রচার বার্য করিবার নিমিত্ত পূর্ববৎসে গিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-বধূটী নারী-কর্ম-মন্দিরের এক নির্জন কক্ষে এই চির-কুমার কস্মীর নিকট গীতা পড়িতেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মফঃস্বল হইতে যে সকল মহিলা কস্মী আসিয়াছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই নারী-কর্ম-মন্দিরের সৃষ্টি হয়। প্রথমে উহা ভবানীপুরে দেশবন্ধুর সাক্ষাত্ তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার অন্ততম নহকারী শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার মজুমদার মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার যখন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখাইলেন, তখন তাঁহার উপরেই নারী-কর্ম-মন্দিরের ভার অপিত হয়, এবং উহা কলিকাতা সীতারাম ঘোষের প্রতীক্ষে স্থানান্তরিত হয়।

সেই ব্রাহ্মণ বধূটী স্বামী ছাড়িয়া আসিবার পর আর গৃহে যান নাই—কলিকাতাতেই থাকেন। নব প্রণয়ীর সহিত অবৈধ সংসর্গের ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা যায়। তখন দেশ-কস্মী যুবকটী সেই বধূটীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যাঁহারা এই অবৈধ প্রণয়ে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে এ বিষয়ে জানান। কারণ যুবকটী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, কিন্তু তিনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

কস্মীদলের মধ্যে নারী পুরুষের এই প্রকার কল্পুষিত

‘পিকেটিং’ কৱিবার সময় পুলিশ মহিলা কর্মদেরও গ্রেপ্তার কৱিত। একবার শ্ৰীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্ৰীযুক্তা বগলা শোম প্ৰভৃতিকে থানায় নিয়া সাবধান কৱিবা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমৰা পুলিশকে ভয় কৱিতাম না। কাৰণ ঘঁটিৰ পাহাৰাওয়ালা হইতে পুলিশেৰ উচ্চ কৰ্মচাৰী পৰ্যন্ত সকলেৰ সহিত আমাদেৱ বিশেষ পৱিত্ৰ থাকে। আমাদেৱ কয়েক জনকেও পুলিশ ধৰিয়া থানায় নিয়াছিল। সেখানে প্ৰধান কৰ্মচাৰী আমাকে দেখিয়াই একটু মুচ্কি হাসিলেন। দেখিলাম তিনি আমাৰ পৱিত্ৰ। বিখ্যাত অভিনেত্ৰী নৌরদা সুন্দৱীৰ গৃহে তাঁহাৰ সহিত ‘আমাৰ আলাপ হয়। কলিকাতাৰ মধ্যে সকলেই এই ব্ৰাহ্মণ-বংশীয় পুলিশ কৰ্মচাৰীকে ভালুক জানেন। বলা বাহুল্য তিনি আমাদিগকে মুক্ত কৱিয়া দিলেন।

ইহাৰ কিছুদিন পৱে উত্তৰ বঙ্গে ভৌষণ জলপ্লাবন হয়। বণ্য-বিধবস্তু লোকদেৱ সাহায্যেৰ জন্য কলিকাতায় নানাপ্ৰকাৰে চাঁদা তোলা হইতে থাকে। ইহাৰ জন্য এক কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠিত হয়। আচার্য্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায় এই প্ৰতিষ্ঠানেৰ প্ৰধান অধিনায়ক হইয়া-ছিলেন। ছাত্ৰ ও যুবকেৱা ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণ গান গাহিয়া ভিঙ্গা কাৰ্যতে আৱস্থ কৱিল—ধনী লোক স্বতঃ প্ৰবৃত্ত হইয়া বহু অৰ্থ দান কৱিলেন—থিয়েটাৰ, বায়ুঙ্কোপ কোম্পানীৰ মালিকেৱা বেনিফিট নাইট্ৰে ঘন্দোবস্তু কৱিলেন;—ছেট ছেট ক্লাব ও নানাপ্ৰকাৰ সমিতি অভিনয়াদি আমোদ-প্ৰমোদেৱ দ্বাৰা অৰ্থ সংগ্ৰহ কৱিলেন, গৰ্ভৰ্মেণ্টেৰ পক্ষ হইতেও সাহায্যেৰ জন্য সামান্য টাকাৰ মণ্ডুৱ হইল।

অসহযোগ আন্দলনেৱ সময় প্ৰকাশ কৰ্ম ক্ষেত্ৰে নামিয়া

আমাদের সাহস বাড়িয়াছিল। স্বতরাং এই ব্যপারেও আমরা উৎসীন রহিলাম না। আমাদের দল পূর্বে হইতেই এক প্রকার গঠিত ছিল। তবে এবার উহাকে আরও বড় করিতে হইল। আমরা প্রস্তাব করিলাম, নিজেদের মধ্যে চাঁদা না তুলিয়া দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে হইবে। তদনুসারে হাড়কাটা গলি, রামবাপান, সোনাগাছি, ফুলবাগান, চাঁপাতলা, আহিরৌটোলা, জোড়াসাঁকো, সিলা, কেরাণীবাগান প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লীর পতিতাগণ পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতে বাহির হইল।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য ! কলিকাতায় অধিবাসীগণ সন্তুষ্টি হইয়া গেল। এক এক দলে প্রায় ৫০৬০ জন পতিতা নারী—তাহাদের পরিধানে গেরুয়া রংয়ের লালপাড় সাড়ী—এলো চুল পিঠের উপর ছড়ান—কপালে সিঁচুরের ফোঁটা—কঞ্চে মধুর সঙ্গীত—মনোহর চলনভঙ্গী, সঙ্গে করেকজন পুরুষ ক্লেরিয়নেট ও হারমনিয়ম বাজাইতেছে। অগ্রে অগ্রে দুইটি নারী একথানি শালুর নিশান ধরিয়া যায়, তাহাতে কোন্ পাড়ার পতিতা নারী সমিতি, তাহা লিখিত আছে। তাহার পশ্চাতে অপর দুই নারী একথানি কাপড় ধরিয়াছে, তাহাতে দাতাগণ টাকা, পয়সা নোট প্রভৃতি ফেলিয়া দিতেছে। আর দুইজন স্ত্রীলোক পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে।

বেশ্যাদের মধ্যে অনেকেই যে খুব সুন্দরী তাহা নহে, তবে তাহারা সকলেই নিতান্ত কুৎসিং একথা ও সত্য নয়। যাহা হউক, সুজিয়া বাহির হইলে পতিতা নারীদের সকলকেই সুন্দরী দেখায়। কারণ, ইহার উপরেই তাহাদের ব্যবসার ভিত্তি। ক্রম দেখাইয়া

জন-সাধারণকে প্রলুক্ত করিবার জন্য কলিকাতার রাজপথে বেশ্যাদের দাঁড়াইবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে তাহাদিশকে পুলিশে বাঁধিয়া নেয়। প্রলুক্ত করিবার জন্য তাহারা তাহাদের দরজার চৌকাঠের বাহিরে আসিতে পারে না। শুতরাঃ, খাঁটি বেশ্যা পল্লীতেও তিন চারিটা স্টুলোককে কদাচ রাস্তার উপরে এক সঙ্গে দেখা যায়। এমন অবস্থায় যদি বেশ্যারা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া চলিতে থাকে, তবে তাহা সাধারণ লোকের চক্ষে কেমন লাগে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমি পূর্ববই বলিয়াছি, নিত্য অসংযম ও ভোগ লালসার মধ্যে থাকাতে পতিতা নারীদের চরিত্রে কুভাবই প্রবল থাকে। অসহ-যোগ আন্দোলনে দেশপ্রীতির ভাব, অথবা বন্তা-পীড়িতের সাহায্যে ভিক্ষা করার কার্যে দয়ার ভাব পতিতা নারীদের চিত্তকে নিশেষ অধিকার করে নাই। আমরা নিজেদের লোকের সম্মুখে জাহির করিবার একটা শ্রযোগ পাইয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি, এইমাত্র। সকলে না হউক অন্ততঃ অনেকে।

আমরা যখন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতাম তখন শত শত লৈক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

বন্তা-পীড়িত দুর্দশা-গ্রস্ত নরনারীর দুঃখে কাতর হইয়া সকলেই আমাদের তহবিলে টাকা দিত না ; আমাদের রূপ দেখিয়া, আমাদের গান শুনিয়া, আমাদের কটাক্ষ খাইয়া, তাহারা মুক্ষ হইয়া টাকা দিয়া যাইত। ছাত্র ও যুবকের দল এত লোকের ভিড় ঝুঁত না।

সংকালে ও সঙ্কায় দুই বেলাই পতিতা নারীর দল অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইত। আমরা বহু সহস্র টাকা পাইয়াছিলাম, কিন্তু

নানা অপব্যয় করিবার পর তাহার অংশ বিশেষ মাত্র কেন্দ্রীয় সমিতির তরবিলে পৌছিয়াছে। আমরা যাহা কিছু দিয়াছি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের টাকা লইতে স্বনীতিবাদী ব্যক্তিদের আপত্তি ছিল; কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া মত করিলেন।

ক্রমশঃ আমরা ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের যুবক ও কুলবধুদের সহিত মেলামেশা করিবার অধিক সুযোগ পাইতে লাগিলাম। অবশ্য পূর্বেই যে তাহা ছিলনা এমন নয়। দ্বাদশ গোপাল, তারকেশ্বর, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে ও মেলায় আমাদের আবাধ গতিবিধি ছিল, এখনও আছে। তাহাতেও সমজের কিছু অবনতি ঘটিতেছে। তবে সে সকল স্থলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে বাস্ত থাকে—পতিতা নারীদের সহিত অলাপ পরিচয় করিবায় বিশেষ প্রলোভন অথবা অবসর কাহারও ঘটেন। কিন্তু এবার অসোহযোগ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে ভাবে বাহির :হইলাম, তাহাতে ভদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সহিত আমাদের কথাবার্তা প্রয়োজন বশতঃ অনিবার্যই ছিল। মেলায় অথবা তীর্থস্থলে জনতার মধ্যে পতিতা নারীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহারা সাধারণের চক্ষে অমন জাজজ্বলামান হয়ন। কিন্তু আমরা ভিক্ষার ছলে অথবা পিকেটিং করিবার জন্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতাম, তাহাতে সর্বসাধা-রণের মুন্ফদৃষ্টি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া যাইত না।

মহান্নামা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্গত আরও কয়েকটি প্রধান বিষয় ছিল,—অপৃশ্যতা দূর, চরকা ও খদর। আমাদের পতিতা নারীসমাজে ইহার ফল কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে

বলিতেছি। অস্পৃশ্যতা দুর বলিতে মহাত্মা গান্ধী বোধ হয় এই
বুঝিয়াছিলেন যে, হাড়ী, মুচি, ডোম, চওল, পারিয়া, দুলে বাংদী,
সাঁওতাল, দোসাদ প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর লোক পরিষ্কার পুরিচ্ছন্ন
থাকিলে তাহাদের পরিবেশিত অন্নজল উচ্চ বর্ণের লোক গ্রহণ
করিতে পারিবেন, এবং এই সকল অন্ত্যজ জাতির লোক শুন্দদেহে
ও পবিত্র পরিচ্ছদে দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু
মহাত্মা গান্ধীর কোন কোন ভক্ত বেশ্যাদিগকেও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের
অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে ‘চল’ করিবার চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। একগা বোধ হয় সকলেই জানেন, পতিতার
গৃহে যে সকল ভদ্রলোক গমন করেন, তাহারা গোপনে সেই নারীর
স্পষ্ট সর্বপ্রকার খাত্ত ও পানীয় গ্রহণ করেন—শুধু গ্রহণ করেন
বলিলে কথাটা অসম্পূর্ণ থাকে—গ্রহণ করিয়া কৃত্তির্থ হন। যে
কার্য্যটী গোপনে হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ্যে করাই এই গান্ধী-
ভক্তদের উদ্দেশ্য ছিল। দেবমন্দিরে প্রবেশ বেশ্যাদের পক্ষে
কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের সাজ পোষাক দেখিয়া
পুরোহিত ঠাকুরের চমক লাগিয়া যায়—প্রচুর দক্ষিণার লোভে,
তিনি—না বলিতেই দ্বার উশুক্ত করিতে আদেশ দেন।

পতিতাদের প্রতি এই অপূর্ব সহানুভূতির ফলে নানাস্থানে
পতিতা নুরীসঙ্গে স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে বরিশালের বেশ্যা-
সমিতিই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে আমার
বন্ধু কালৌদাসীর বাড়ীতে বরিশাল হইতে একটী বারবন্তি আসে।
তাহার নাম এখন ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় বসন্তকুমারী
হইবে। যাহা হউক, এই বসন্তকুমারীকে লইয়া এক তরুণ ছাত্র-যুবক

কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটী কোন ধর্মী ব্যবসায়ীর পুত্র। বাপের লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া অটশত কাটা লইয়া পতিতা-প্রণয়ণীকে কলিকাতায় আনিলেন। বসন্তকুমারীর মুখে শুনিলাম, বরিশালের এক বিখ্যাত দেশকর্মী দার্শনিক ব্যক্তি তরুণ যুবকদের দ্বারা পতিতালয়ে অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিতেছেন। তথাকার বারবণিতাগণ চরকায় সূতা কাটিতেছে ও খদ্দর পরিধান আরম্ভ করিয়াছে। আমি এত উৎসাহিত হইলাম যে আমিও একটা চরকা কিনিয়া ফেলিলাম—খদ্দরের শাড়ী ব্রাউজ পড়িতে লাগিলাম।

আমার চেষ্টায় রামবাগানে দশ বার জন পতিতা নারী চরকায় সূতা কাটিতে লাগিল। কেহ কেহ খদ্দর পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে সব শেষ। চরকা খদ্দর বন্ধ হইয়া গেল। তা' হইবার কথা—কারণ সংযম ও পবিত্রতার ভিত্তি ব্যতীত উহা দাঁড়াইতে পারে না।

একদিন দেখিলাম কোন খবরের কাগজে লেখা হইয়াছে—“কি দুঃখের বিষয়—‘অশ্বিনীকুমারের বরিশালে আজ যুবকেরা পতিতার সংপর্শে ঘাইতে বিচুমাত্র লজ্জিত হয় না।’” আমি বসন্তকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম “ভাই, তোমাদের করিশালে অশ্বিনীকুমার কে? বসন্ত বলিল “আমি তিন মাস পূর্বে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে বরিশালে আসি। অশ্বিনীকুমারের পরিচয় আমি জানিনা—উনি বোধ হয় জানিতে পারেন।” বসন্ত তাহার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। যুবকটী পাশ্ববর্তী পালকের উপর শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিকৃতস্বরে গাহিতেছিলেন—

“এখনও তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বঁশী শুনেছি ।

মন প্রাণ যা’ ছিল তা’ দিয়ে ফেলেছি” ।—

বসন্তের কথায় আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “অশ্বিনী বাবুর
নাম শুনেন নি ! — স্বনামধন্য পুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত । আপনি এত
পড়াশুনা করেছেন— তাঁর ভক্তিযোগ পড়েন নি ? — একবার পড়ে
দেখেনে । পবিত্র ওরিত্রের এমন উচ্চ আদর্শ আর কোথাও নাই !
অশ্বিনী বাবুর হাতে গড়া বরিশাল ।” আমি বলিলাম “সেই অশ্বিনী
কুমার দত্ত ! হাঁ, তাঁর নাম আমি জানি ।”

আমি তাঁর মুখের উপর জবাব দিলাম “আপনি সেই বরিশালেরই
যুবক— না ? যুবকটী নিল্লজ্জের মত পুনরায় গাহিতে লাগিল—

“শুধু স্বপনে এসেছিল যে,
নয়ন কোনে হেসেছিল মে” ।—

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম । আমার মনে হইল, মানুষ এত
বড় ভঙ্গ হইতে পারে— একটা মহান আদর্শকে প্রশংসা কর্বার
সঙ্গে সঙ্গে নিজের কার্য দ্বারা অম্ভান বদনে তাহাকে পদচালিত করিয়া
‘ফায় । যাহা হউক, বসন্তের প্রণয়ী এই যুবকটী আমাকে একদিন
অশ্বিনী বাবুর ‘ভক্তিযোগ’ পুস্তকখানি আনিয়া দিলেন । বলিলেন,
ইহা ‘আমার উপহারস্বরূপ গ্রহণ করুণ ।’ সেই অবধি আমি
ভক্তিযোগ মাঝে মাঝে পাঠ করিতাম ।

এই পতিতা-নারী-সমিতির প্রভাব ক্রমশঃ এতদূর বিস্তৃত হইল
যে একদল স্বনীতি-জ্ঞান-সম্পদ বাস্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান
হইলেন । সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রথমাবধি

ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। এ সংবাদ পত্রে তিনি চিরদিন এই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিমাচলের মত দৃঢ় চিন্ত এই মহাপুরুষকে আমি জীবনে কয়েকবার মাত্র দেখিয়াছি; তাহাতে তাহাকে দেবতা সদৃশ বলিয়া আমার মনে হইয়াছে—তাহার কথা আমি আরও দুইটী পতিতা নারীর মুখে শুনিয়াছি—তাহাদের নাম স্বরূচি ও উষাবালা। যথাস্থানে ইহাদের কথা বলা হইবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে ‘এখানে আরও দুই একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাহার স্বনীতি ও পবিত্রতার আদর্শের তুলনায় আমরা অতি হীন—নরকের কীটানুকৌট। তথাপি তাহার কথা এই জন্য বলিতেছি, তাহাতে আমার চরিত্র আরও পরিষ্ফুট হইবে। কৃষ্ণবাবু দুর্বৃত্তিকে কখনও কোন মিগ্যা অজুহাতে ক্ষমা করেন নাই—কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ খিয়েটারের অভিনেত্রোদের গান শিখাইতে যান বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র পতিতার দান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাহার উপরও দোষারোপ করিয়াছেন—ডাক্তার বিমল চন্দ্র ঘোষ ‘সর্ব সদনের’ সাহায্যার্থ বেশ্যার দ্বারা নাট্যাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাহার অজস্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চর্মী গান্ধুলী মিনার্ডা খিয়েটারে বেশ্যাদের সভায় মহিলা ভলাট্টিয়ারদের নেত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া তৎসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। ইহারা সকলেই ব্রাহ্ম সমাজের এক এক জন বিশিষ্ট দৃঢ়ত্ব। আমার সকল প্রণয়ীই ইহাকে ভয় করিত।

মহাত্মা গান্ধী যখন বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি বরিশালে গমন করিলে সেখানকার পতিতা-নারী-সমিতি তাহাকে

নিম্নণ করে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সেই সমিতিতে যান নাই।
তিনি বলেন “পতিতারা যদি একত্র মিলিত হইয়া সমিতি গঠন করে
তবে দেশের চোর ডাকাতরাও সমিতি গঠন করিবে।” সেই
দার্শনিক দেশকর্মী মহাশয় মহাত্মাজীর তিরস্কার লাভ করিয়া এক্ষণে
বরিশালের কৰ্ম ক্ষেত্র হইতে নাকি চলিয়া গিয়াছেন।

আমার জীবনেও এদিকে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছিল।
রাজনৈতিক আন্দোলনে বাহির হইয়া দেশকর্মী যুবকদের মধ্যে
বিচরণ করিবার সময় আমি আত্ম-সংঘম করিতে পারি নাই।
আমার কায়িক ও মানসিক অপরাধ হইয়াছে। যেখানে শিক্ষার
অভাব—যেখানে শাসন নাই—যেখানে অহঙ্কারই প্রবল, সেখানে
একপ ত হবেই। আমার সেই বাক্ষের কর্মচারী—পাধ্যায় বাবুটী
আমার বে-চাল লক্ষণ করিয়াছেন—আমার আচরণ সন্দেহের চক্ষে
দেখিয়াছেন।

এদিকে তিনিও অপরাধী হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে
থিয়েটারে একটু বেশী ধাওয়া-আসা করিতে দেখিলাম। একদিন
থিয়েটারে গ্রীন রুম বা সাজ ঘরে কোন অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার
হাঁস্টং পুরুষার্থের সময় আমার দৃষ্টি সেই দিকে পরিল। আমরা
দু'জনেই থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাকে বক্সে রাখিয়া
তিনি ছল করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন; গোপনে আমিও গিয়াছিলাম।

আমাদের দ্রুজনেরই হৃদয় বর্ষার বিদ্যুৎপূর্ণ দুইখানি মেঘের মত
পরস্পর নিবট্টে আসিতেছিল। আশঙ্কা করিতেছিলাম, একদিন
দিগু দিগন্ত কম্পিত করিয়া দারুণ বজ্রপাত হইবে।

ନବମ

ପଞ୍ଚିଲ ଆବର୍ତ୍ତଣ

ମତ୍ତପାନ ବନ୍ଧ କରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିର ଆନ୍ଦୋଳନେର ଆର ଏକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଛିଲ । ତେବେମାରେ ଯୁବକେର ଦଲ ସ୍ଥାନେ ମଦେତ୍ ଦୋକାନେ ପିକେଟିଂ କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଆମାଦେର ଚାକର ଏକଦିନ ବାବୁର ବନ୍ଧୁଦେର ଜନ୍ମ ମଦ ଆନିତେ ସାଇୟା ବାଧା ପାଇଁ । ଯୁବକେରା ତାହାକେ ଘରିଯା ଫେଲିଲ । ତାହାରା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ “କାର ଜନ୍ମ ମଦ କିମେଛିସ୍ ?” ଆମାଦେର ଚାକର ଆମାର ବାଡୀର ନନ୍ଦର ବଲିଲ । ତାହାରା ନାମ ଜାନିତେ ଚାହିଲ । ଚାକର ବଲିଲ “ଫିରୋଜା ‘ବିବିର ସର ।’” ଆମି ଫିରୋଜା ରଂଘେର ଜାମା କାପଡ଼ ପରିତେ ଭାଲବାସିତାମ ବଲିଯା । ରାମବାଗାନେ ଆମାର ଡାକନାମ ଛିଲ ଫିରୋଜା ବିବି । ଚାକରଟୀ ତଥନ କୋନ ପ୍ରକାରେ ଛାଡ଼ାନ ପାଇୟା ଆସିଲ ।

ପରଦିନ ଦୁପୂର ବେଳାର ଖାଓୟାର ପର ତ୍ରକ୍ଟୁ ବିଶ୍ରାମ କରିତେଛି, ଏମନ ସମୟ ଚାକର ଆସିଯା ଜାନାଇଲ, ଏକଜନ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖା କରିତେ ଚାହେନ । ଆମି ତାହାକେ ସରେ ଆନିତେ ବଲିଯା ବିଛାନା ହିତେ ଉଠିଯା ଦ୍ଵାଙ୍ଗାଇଲାମ । ଦେଓୟାଲେର ଗାୟେ ଝୁଲାନ ବୁଝି ଆୟନାର ସମ୍ମୁଖେ ଯାଇୟା ଚୁଲ ଓ ପରଣେର କାପଡ଼ ଠିକ କରିତେ ଛିଲାମ । ‘ଅକ୍ଷ୍ୱାଙ୍ଗ ଏକ—ଆୟନାର ମଧ୍ୟେ କାହାର ପ୍ରତିବିଷ୍ଵ ପରିଲ ?—ଆମି ‘ତମକିତ ହଇୟା ଦରଜାର ଦିକେ ଫିରିଯା ଦେଖି ନନ୍ଦ ଦାଦାର ଏକ ବନ୍ଧୁ’ ।

ତାହାର ପରିଧାନେ ଖଦରେର ଧୂତି—ଗାୟେ ଖଦରେର ଏକ ଚାଦର—ପାଯେ ମଦ୍ରାଜୀ ସ୍ତାଣ୍ଡେଲ, ହାତେ ଏକଟା ମୋଟା ଲାଠି । ମାଥାର ଚୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଯା ଛାଟା । ଆମି କିଛୁମାତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାବିନା

দেখাইয়া স্পষ্টস্বরে একটু তিরিক্ষি মেজাজে' বলিলাম ‘আপনি
কে ?—এ সময়ে আপনার কি প্রয়োজন ?’ কিন্তু আমার বুবঃ
কাঁপিতেছিল।

নন্দ দাদার বন্ধু আমার আপাদ-মস্তক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া
বলিল, মানী তুমি এখানে ?” আমি বলিলাম, আমার নাম ফিরোজা
বিবি,—।” নন্দ দাদার বন্ধু ভিতরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া
লাঠিটা সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিল। আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম।
নন্দ দাদার বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া বলিল “বস না এই
খানে !” আমি ঘন্টা চালিতের মত বসিয়া পড়িলাম। মাথা নাচু
করিয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিলাম। নন্দদার বন্ধুর নাম উপেন্দ্র।

নন্দ দাদার বন্ধু আমাকে বলিল “মানী, তুমি শেষে এই
করিলে ?—পড়াশুনার এই পরিণাম ?” আমি নন্দদার বন্ধুর পায়ে
পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সে বলিল, “কাল রাত্রিতে মদের
দোকানে পিকেটীং করতে এসে তোমার চাকরের মুখে ফিরোজা বিবির
ঠিকানা পেয়েছি। আমরা মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মন্ত্রপান
রহিত করতে প্রতিষ্ঠা করেছি। বেশ্যাদের ঘরেও আমরা এই জন্মে
যাই। আজ ফিরোজা বিবির ঘরে আস্বার কাজ আমার উপর
পরেছিল। এখানে এসে দেখলাম সে আমারি পরিচিত মানদা।
তা হলে আজ গেকে তোমার ঘরে মন আসা বন্ধ,—মনে রেখো !”

উপেন বাবুর নিকট বাড়ীর সমস্ত সংবাদ জানিলাম। বাবা
মনোজুংখে কলিকাতার সমস্ত বাড়ী বিক্রয় করিয়া পল্লী গ্রামে যাইয়া
বাস করিতেছেন। আমর মামাৰ (নন্দদার পিতার) মৃত্যু হৃঝাছে।
নন্দ দাদা গান্ধীৰ আন্দোলনে মজিয়াছে। মুকুলদা বি এলু পাঞ্জি

କରିଯା...୦୦କୋଟି ପ୍ରୟାକୃଟିଶ କରିତେଛେ । ତାହାର ସାହିତ୍ୟ'ଚର୍ଚାର ଦିକେ ସେଣୀ ମନ ଥାକାଯ ଅର୍ଦ୍ଧୋପାର୍ଜିନ କିଛୁଇ ହୟ ନା । କମଳା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାଶ କରିଯା ଡାକ୍ତାରୀ ପଡ଼ିବାର ଜଣ୍ଯ ପଶ୍ଚିମେ କୋଥାଯ ଗିଯାଇଛେ । ତାହାର ମାତା ଫଲିକାତାର ବାଡା ଛାଡ଼ିଯା ଏଥିନ କମଳାର ସହିତଇ ମେଥାନେ ଥାକେନ । ନନ୍ଦ ଦାଦା ତଥନ ଓ ବିବାହ କରେନ ନାହିଁ ।

ଆମି ତାହାକେ ମାଝେ ମାଝେ ଆସିତେ ଅନୁରୋଧ କରିଲାମ । ଉପେନ ବାବୁ ବଲିଲେନ “ତୋମାର କାହେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଆସା, ତା'ତ ହୟେ ଗେଲ । ଆର ମଦ କିନ୍ବେନା, ବାସ, ଆର ତ କୋନ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।” ଉପେନ ବାବୁ ବିର୍ଚନ୍ନା ହଇତେ ଉଠିଲେନ । ଆମି ତାହାକେ କିଛୁ ଖାଇବାର ଜଣ୍ଯ କତ ମିନତି କରିଲାମ କିନ୍ତୁ ତିନି କିଛୁ ଖାଇଲେନ ନା—ଏକଟା ପାନ ଧର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା । ଏମନ ଚରିତ୍ରବାନ ଯୁବକ କମ୍ପୀ ଓ ଆମାଦେର ସଂସ୍ପର୍ଶେ ଆସିଯାଇଛେ, ସାହାରା ପାପୀର ସଂସ୍ପର୍ଶେ ଆସିଯାଓ ପାପ ହଇତେ ଦୂରେ ଗାକିତେ ସୁମର୍ଦ୍ଦ ହଇଯାଇଛେ ।

ଆମାର ଘରେ ଆର ମଦ ଆସିତ ନା । ବାବୁର ବନ୍ଦୁଗଣ ଅମ୍ବଲ୍‌ଟ ହଇଲେନ—ବାବୁ ଓ ରାଗ କରିଲେନ । ଉପେନ ବାବୁର କାହେ ଆମି ଚିଠିପତ୍ର ଲିଖିତାମ—ସେ ତାହାର ସଂକିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିତ । ଆମାର ବାବୁ ଇହା ସନ୍ଦେହେର ଚକ୍ର ଦେଖିତେନ । ଶ୍ଵତ୍ରାଂ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ମନୋମାଲିଙ୍ଗ ଦିନ ଦିନ ବାଡ଼ିଯା ଉଠିଲ ।

ନନ୍ଦଦାଦାର ଏହି ବନ୍ଦୁଟୀ ଆମାର ପରିଚିତ । ବାଲ୍ୟକାଳେ ତାହାକେ ଆମାଦେର ବାଡାତେ ଅନେକବାର ଦେଖିଯାଇଛି । ତିନି ନନ୍ଦଦାଦାର ପ୍ରତିବେଶୀ ଏବଂ ଦୂର ସମ୍ପର୍କିତ ଆହୀୟ । ନନ୍ଦଦାଦାକେ ଆସିବାର ଜଣ୍ଯ ଅନେକବାର ବଲିଯା ଦିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତିନି ଆମାର ଏହି ପରିଣାମ ଶୁଣିଯା ଆର ଆମାର ନିକଟ ଆସେନ ନାହିଁ ।

ଦୁଇ ତିନ ମାସେର ମଧ୍ୟେଇ ଆମାର ଏହି ପାଖ୍ୟାଯ ବାବୁ ଆମାକେ ଛାଡ଼ିଯା ଦିଲେନ । ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀର ସହିତ ତାହାକେ ହାସ୍ତ ପରିହାସ କରିତେ ଦେଖି-

য়াছিলাম, তাহারই ঘরে তিনি ঘাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন ব্যাক্ষের টাকায়ই নটীর পূজা আরম্ভ হইল। অপব্যয়ের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাক্ষ ফেল হইল। তিনি নিজেও গেলেন, দেশের লোকেরও সর্ববনাশ। অনেক ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান এই-ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের আজীবন সঞ্চিত ধন, ব্যাক্ষ ফেল হওয়ায়, তাঁহারা ভিধারী সাজিয়াছেন। আপনারা মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। কোনও পুরাতন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাও তাহার মানেজারের বেশ্যাশক্তির ফলে বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমি মনে করিলাম আর কাহারও নিকট দাঁধা থাকিবনা। ভাল গায়িকা, বলিয়া আমার সুনাম ছিল—আমি সোনাগাছিতে উঠিয়া গেলাম। এইখানে রাজসাহী জেলার কোন জমিদার যুবক আমার গৃহে আসিতেন। তিনি অতিশয় মগ্নপায়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই খিয়েটারে যাইতাম। একদিন বক্সে বসিয়া আচি-জমিদার বাবুটি অতিরিক্ত মগ্নপানে একটু মাতলামি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানিতাম না—বাবুর শাশুড়াটি নিকটবর্তী আর এক বক্সে বসিয়াছিলেন। তিনি নাকি পূর্ববন্দের শেন বিশিষ্ট জমিদার গৃহিণী। জামাতার এইরূপ লক্ষ্যজনক আচরণ দেখিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে জামাতাকে তখনি নিজগুচ্ছে লইয়া গেলেন। এখন সেই জমিদার বাবুটি সত্যবালা নাম্বী আমার পরিচিতি এক পতিতার ঘরে যান। সমাজে তাঁর মান মর্যাদা যথেষ্ট।

আমি মাঝে মাঝে বড়লোকের বাগান অথবা মজলিসে গানের মুজুরায় যাইতাম। ইহাতে অর্থেপার্জন হইত বটে, কিন্তু বিপদও ছিল। বড়লোকের খেয়াল মাফিক চলা যে কি বিরক্তিজনক, তাহা

বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সারারাত্রি জাগরণ, ভালবাসার ভাণ, মাতলামির বঞ্চাট—এই সব করিতে শরীর মন একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িত। ভাবিতাম—আর না, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলি। হৃদয়ে দারুণ অনুত্তপ উপস্থিত হইত। কিন্তু প্রলোভন কখনও জয় করিতে পারি নাই—বার বার ঘূর্ণিপাকে পরিয়াছি।

১৯২৪ সালের বর্ষাকালে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়। বর্তমান মোহন্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে পূর্ববাবধি নানাবিধ অত্যাচারের অভিযোগ ছিল। তদনুসারে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য গভর্নেন্ট রিসিবার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী সচিদানন্দ ও বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে মহাবীরদল রিসিবারের মন্দির-প্রবেশ বাধা দেন। এদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসীদল প্রবেশবিকার দাবী করেন। তাঁহারা বলেন মোহন্তের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রাসাদের মধ্যে যে মূর্তি আছে, তাহা দর্শন ও পূজা করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই গোলযোগের মধ্যে মহাবীরদল, গভর্নেন্ট, মোহন্ত, কংগ্রেস সকলে জড়াইয়া পড়িল। মারানারি লুটপাট প্রভৃতি তুমুল কাণ্ড চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রায় দশ বার জন পতিতা নারী-তারকেশ্বরে যাত্রা করি। সেখানে যাইয়া দেখিলাম লগলী, শ্রীরামপুর, মোনাডাঙ্গা, সেওড়াফুলি প্রভৃতি স্থান হইতে আরও বেশ্যা আসিয়াছে। আমরা সকলে মিলিয়া মহিলা-ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিলাম এ সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিবার জন্য আমরা কিছু টাকা চাঁদাও তুলিয়াছিলাম।

মোহন্তের প্রাসাদের সম্মুখে সত্যাগ্রহ করিতে কংগ্রেসীদলে আমাদিগকে দিলনা। মন্দির রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য হইল। স্বামী সচিদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে আসিলে আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলাম। পুলিশ বিফল মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল। আমরা পালা করিয়া মন্দিরের দ্বারে প্রহরীর কার্য করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র গুহরায় ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমারী গুপ্তা টেক্টারাই তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহের প্রধান পরিচালক ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন যাইয়া আমাদের সকলকে উৎসাহিত করিয়া আসেন। আমাদের স্থু ও স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। সত্যাগ্রহ তহবিলে বহু সহস্র টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। যথাসময়ে তারকেশ্বর সমস্তার এক প্রকার মীমাংসা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সেখানে যে বীভৎস বাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। মহিলা ভলাণ্টিয়ার নামধারী বেশ্যাদের সহিত বিভিন্ন দলের ভলাণ্টিয়ার নামধারী অনেক ভগু লম্পটের অবাধ কল্পুষিত সংযোগ—যাঁহারা দেশকম্বী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের কৃত্তারও রাত্রিযাপন সমস্তা—আমার নিকট কোন সত্যাগ্রহী বাক্তৃর প্রস্তাব—এই সব দেখিয়া মনে হইয়াছে, তারকেশ্বরে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, নাই—তথায় পুণ্যের আলোক নিভিয়া গিয়াছে।

সেখানে দেব-দর্শনার্থী স্বৃকৃতি নান্মো এক যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হয়। সাবিত্রী নামে স্বৃকৃতির এক ভগী ছিল। ইহারা কলিকাতা জোড়াসাঁকো পল্লীর বিখ্যাত উচ্চ বংশের কন্যা। লোকে বলে এই বংশে লক্ষ্মী সরন্তৰীর বিবাদ নাই। স্বৃকৃতি ও সাবিত্রী

উভয়েই পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোভাবাজারে বাস করে। গভর্নমেণ্টের একজন উকীল স্বীকৃতির ঘরে ঘাতায়াত করিয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্বে সাবিত্তীর মৃত্যু হইয়াছে। একজন বড় দেশকর্মী তাহার কাছে যাইত। যে সকল পরিবার বাংলার গোরব, তাহাদেরও আজ এ কি অধঃপতন ! ইহার নিকট বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির যে ইতিহাস শুনিয়াছি, তাহা লিখিলে হয়ত আইনের দায়ে পড়িতে হবে— এজন্য লিখিলাম না। এই পরিবারই অবাধ মেলামেশার পথ প্রদর্শক।

‘উপেন বাবুর নিকট শুনিয়াছি, নন্দদার সংযম আটুট রহিয়াছে। কোন নারী তাহার সম্মুখে প্রলোভন লইয়া আসিতে পারে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের ভাল দিকটা তাহার পূর্ব গঠিত চরিত্রকে আরও শুনুচ করিয়া তুলিয়াছে। বিলাস শূন্যতা ও সৎকার্যে আসক্তি এই দুইটী তাহার ব্রহ্মচর্যের প্রধান সহায়। আমার মত সাহিত্য চর্চা না করা নন্দদার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে। দারিদ্র্য তাহার বন্ধুর কার্য করিয়াছে। এমন নির্মল চরিত্রের কর্ম্মাও আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প।

আমার সমস্কে নন্দদাদা নাকি এই কথা বলিত “মানদা যদি তা’র পাপজীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে এক বন্দে আমার কাছে আসে, আমি তা’কে আদরের সহিত মাথার মণি ক’রে রাখ্ৰ—বোন্ ব’লে তেমনি শেহ ক’র্ৰ। কিন্তু সে পতিতা-পল্লীতে—‘পতিতাবৃত্তিতে থাকিলে আমি তাহার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্তে পারি না।’”

আমি কখনও সিগারেট অথবা মদ খাই নাই। পতিতা নারীদের এই অভ্যাস অর্থেপার্জনের অনুকূল নহে। আমার বাবুগুলি আমাকে এই নেশা দুইটী ধরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিছেন, কিন্তু

কেহই' সফলকাম হন নাই। উপেন বাবু মঘপান নিবারণের জন্য বেশ্যাদের গৃহে পিকেটিং অনেকদিন চালাইয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছি।

পূজার ছুটী, বড়দিনের অবকাশ প্রতি উপলক্ষে মফস্বলের উকীল ও আফিসের কর্মচারীগণ কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। তখন আমাদের গৃহে তাঁহাদের অনেকের শুভাগমন হয়। যাঁহারা জমিদার ও ব্যবসায়ী তাঁহারা অন্য সময়েও আসিতে পারেন। অনেকে মফস্বল হইতে এখানে তাঁহাদের রক্ষিতাদিগকে মাস মাসে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। মোয়াখালির এক রায়-বাহাদুর, বর্দ্ধমানের এক জমিদার, ঢাকার এক বড় ঔষধ ব্যবসায়ী, রংপুরের এক উকীল ইহাদের নিকট হইতে আমি মাসিক কিছু টাকা পাইতাম। চৌৎপুরে বিশিষ্ট সোণার খণের মেয়ে প্রতা নামে আমার এক বন্ধু আছে। ময়মনসিংহের এক উকীল তাহার বাবু, ঢাকার সেই ব্যবসায়ীর সহিত ইহার নাকি পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঢাকার লোকটী আমার ঘরে আসিত। প্রতাৰ বাড়ীতে কলিকাতার এক ব্যারিষ্টারে কুমারী কন্যাও আছেন। এইরূপে নিত্য নৃতন লোক লইয়া 'সোনাগাছিতে আমার দিন কাটিতে লাগিল। বিশিষ্ট ঘরের পতিতা 'মেঁয়েদের সঙ্গে আমি একটু বেশী মেলামেশা করিতাম। এই ব্যারিষ্টার কন্যার মত নিভিক পতিতা আমি কম দেখিয়াছি।

এই সময়ে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ হইল। আমি এস্বলে তাহার বণ্ণা করিতেছি। তাহাতে বুঝা যাইবে, কি ঘোরতর পাঁপ সমাজের মধ্য প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রতিকৃতি কি঱ুপে হইতে পারে তাহাও সমাজপতিদের ভাবিয়া দেখা কৈর্তব্য।

, কলিকাতার মধ্যভাগে বাড়ুড়বাগান পল্লীর নিকট এক জমিদার
বাস করে। তাঁহার পূর্বপুরুষ নাকি শুপরিচিত বিখ্যাত বাত্তি।
সেই জমিদার অতিশয় দুশ্চরিত। প্রতিবেশী গৃহস্থদের কুলবধূর
উপর তাঁহার কুদৃষ্টি। তাঁহার দুষ্কার্যের সহায় কতকগুলি বন্ধু ও
অনুচর আছে। ইহারা নানা কৌশলে গৃহস্থের কুলবধূদিগকে
প্রলুক করিয়া প্রভুর কাম-লালসা তৃপ্তির জন্য লইয়া আসে।
কখনও কলিকাতার প্রাসাদে, কখনও বা নিকটবর্তী বাগান বাড়ীতে
এই সকল পাপলীলার অনুষ্ঠান হয়।

গৃহস্থের কুলবধূরা কেহ প্রলোভনে স্বেচ্ছায় কেহ বা অনিচ্ছায়
বাধ্য হইয়া আসিয়া থাকে। তাহারা অনেকেই গান জানে না, মন্ত্র
পান ও করে না। এই প্রকার আমোদের জন্য সোনাগাঢ়ী অথবা
রামবাগান হইতে পতিতা নারীদিগকে নেওয়া হইত। আমি এই
জমিদারের বাগান বাড়ীতে দুই একবার গিয়াছিলাম। প্রতিরাত্রিতে
এক শত টাকা লইতাম—গান গাওয়াই আমার কার্য ছিল। আমি
মদ খাইতাম না। আরও দুই তিনটী বেশ্যা যাইত। তাহারাই
মন্ত্র পানের আমোদে ঘোগ দিত।

একরাত্রিতে জমিদারের বাগান বাড়ীতে আমার যাইবার জ্ঞান
পড়িল। আমি আমার পাওনা টাকাকড়ি অগ্রিম লইয়া রাত্রি
আটটার সময় তথায় যাই। দেখিলাম, একটী শুন্দরী মুবতী কুল-
বধূকে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮।১৯ এইরূপ
হইবে। গায়ের রং ফেন কাঁচা সোণা—মুখখানি কোমল, লাবণ্য-
মাথা; আমার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল। এই দুর্ভুতি জমিদারের
পাপ প্রবন্ধির কবলে কত সতীর বলিদান দেখিয়াছি। আমরাও

এই পাপের ভাগী। সে রাত্রিতে গানে আমার মন লাগিল
না। আমি এই বধূটির সহিত কথাবার্তার স্থোগ খুঁজিতে
লাগিলাম।

আমোদ-প্রমোদ আরস্ত হইল। জমিরার ও তাহার বন্ধুগণ
মঘপান করিতে লাগিলেন। আমি দুই একটি গান গাহিলাম।
অন্যান্য বেশ্যারাও তারপর নাচিতে গাহিতে আরস্ত করিল।
আমি গরমের অছিলায় বাহিরে আসিবার সময় সেই বধূটিকে
আস্তে আস্তে বলিলাম “চল, একবার বাগানে বেড়াইয়া আসি।”
আমরা উভয়ে পুরুরের ঘাটে একটি বেদীর উপরে বসিলাম।
তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইল। তাহার সার মর্শ এই—
বধূটির নাম অপরাজিতা দেবী। সে ব্রাহ্মণ কন্যা। বর্কমান
জেলার কোন গ্রামে তাহার পিত্রালয়। কলিকাতার কোন
মুখোপাধ্যায় যুবকের সহিত নাকি বিবাহ হইয়াছে। তাহার
স্বামী পিসিমার কাছে থাকেন। এই পিসিমায়েরা কয়েক ভগী,
নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করেন। তাহার স্বামীর পিতামাতা
বা অপর কোন আত্মীয় স্বজন বোধ হয় নাই। তিনি অতি নিরীহ
ও শান্ত স্বভাব। সর্বদা পিসিমার মন ঘোগাইয়া চলেন। পিসিমার
মৃত্যুর, পর বাড়ী ও নগদ টাকা নাকি পাইবেন, ইহা তাহার আশা ছিল।

অপরাজিতার পিস্শাণ্ডী নাকি বিধবা অবস্থায়.....
অর্থ উআর্জন করিয়াছেন, এইরকম দুর্গাম আছে। এক্ষণে বার্দ্ধক্যে
নিজে অশক্ত হওয়ায় আতুপ্তু ত্রের বধুদের সতীত্বের বিনিময়ে অর্থ
উপার্জন করেন। অপরাজিতার স্বামীর পুর্বে আরও দুইবার
বিবাহ হইয়াছিল। পর পর সেই দুইটি বধুর অগ্নিদাহে মৃত্যু

হয়। পিস্শাশুড়ী প্রকাশ করেন যে, বধূরা নিজের দেহে আগুণ লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অপরাজিতা তাহার স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্তু—তাহার একটি শিশুপুত্র আছে।

অপরাজিতাকেও তাহার পিস্শাশুড়ী পাপ পথে অর্থ উপার্জন করিতে নিযুক্ত করেন, অপরাজিতা তাহাতে সম্মত নহে। ইহাতে পিস্শাশুড়ী তাহার উপর দিনরাত্রি উৎপীড়ন করিতেন! এক দুষ্ট ডাক্তার পিস্শাশুড়ীর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও দুষ্কার্য্যের সহায় ছিল। অপরাজিতা এতদিন তাহার সতীহীন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে

আমি অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি এখন কি করবে?—তুমিও কি আত্মহত্যা করতে চাও?” অপরাজিতা বলিল, “আত্মহত্যা করব কেন?—আমার বাবা আছেন—ভাই আছেন—আমার ছেলে আছে—আমি আত্মহত্যা করব না। তবে এই লম্পটের হাতে আমি সতীহীন কিছুতেই দিব না, আমার প্রাণ যায়,—তাও স্বীকার।” আমি এই কিশোরী বধূর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও অপূর্ব আত্ম-সংযম দেখিয়া বিশুয়ে স্তুতি হইলাম। এই বালিকা কোন শিক্ষা পায় নাই—লেখাপড়া জানে না; সাহিত্য-চর্চা করে নাই, অগভ ইহার মধ্যে এমন তেজ ও শক্তি কোথা হইতে আসিল?

আমি বলিলাম “তুমি যদি ইহাদের কুপস্তাবে সম্মত না হও, তবে কি হবে তা জান?!” অপরাজিতা বলিল, “হঁ জানি। এরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার পিস্শাশুড়ী আমার এই দুই সতীনকেও মেরে ফেলেছেন, তারপর লোকের কাছে বলেছেন যে,

উহারা কাপড়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুণ লাগিয়ে মরেছে। কিন্তু মানুষ এত বোকা নয় যে, সে কথা আর বিশ্বাস করবে; পর পর দুইটী বৌ একই রকমে মারা যায়। আজ সারাদিন পিস্শাশুড়ীর সহিত আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, আমি' সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিব। শাশুড়ী আমাকে বলেন তাহ'লে তোর গলায় পা দিয়ে একেবারে তোর জীবন শেষ করব! "আমিও সেই থেকে প্রতিভ্রান্ত করেছি, এরা • জীবিত অবস্থায় যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ করতে না পারে,"

অপরাজিতার কগা' শুনিতে শুনিতে আমার মাথা লজ্জায় লুইয়া পড়িল। ভাবিলাম, অপরাজিতা কোন স্বর্গের দেবী—আর আমি কোন নরকের কীট! হিন্দু সমাজে কেবল আমার মত কলঙ্কনাই জন্মগ্রহণ করে না, অপরাজিতার মত সতীও জন্মগ্রহণ করেন। আমার দেহের দূষিত বাতাসে অপরাজিতার পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে—এই ভাবিয়া তাহার সহিত আর অধিকক্ষণ কথা কহিলাম না। দেখিলাম, তাহার পিস্শাশুড়ী ও আর একজন লোক (অপরাজিতা বলিল, লোকটী নাকি..... ভাক্তার) সেইদিকে আসিতেছেন। আমি অপরাজিতার পায়ের ধূলা, নিয়ে তাহাকে প্রণাম করিলাম। সে অগ্রসর হইয়া গেল—আমি একটু লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইলাম।

সে রাত্রিতে আমি আর অমোদ প্রমোদে ঘোগ দিলাম না। শরীর অসুস্থ বলিয়া শীঘ্ৰ চলিয়া আসিলাম। দুঃস্বপ্নে ভাল শুম হইল না। দুইদিন পরে খবরের কাগজে পড়িলাম, অপরাজিতার মৃত্যু, হইয়াছে। তাহার পিস্শাশুড়ী পুলিশের নিকট

জানাইয়াছেন, সকালবেলা উনুনে অঁচ ধরাইবার সময় অসাবধানে কাপড়ে আগুন লাগিয়া অপরাজিতার মৃত্যু ঘটে। শব্দেহের ডাক্তারী পরীক্ষায়, পুলিশ তদন্তে ও করোণারের বিচারে প্রকৃত রহস্য প্রকাশিত হইল না। এই ঘটনার পর প্রায় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত আমি নিতান্ত মানসিক উদ্বেগ ও ‘অশাস্ত্রিতে কাটাইয়াছি। এখনও অপরাজিতার মুখখানি আমার মনে আছে।

এদেশের ঘরে ঘরে এমন কত শোচনীয় দুর্ঘটনা হইতেছে, সে সংবাদ কি সমাজের কর্তৃরা রাখিয়া থাকেন?—সতী-শিরোমণি বালিকাবধূর অভিশাপে সমাজ রসাতনে যাইতেছে। দুর্ভালম্পটেরা অর্থের বলে মান মব্যাদা আদায় করিয়া সমাজের মধ্যে নির্ভয়ে বুক ফুলাইয়া বেড়ায়।

কালীদাসী একদিন আমার বাড়ীতে আসিল ; তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম, রেস্ (ঘোড়-দৌড়ের জুয়াখেলা) খেলিয়া এবং মদ খাইয়া তাহার সেই ভাটিয়া বাবু সর্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার কারবার উঠিয়া গিয়াছে। কালীদাসী এখন এক মাড়োয়ারীর কাছে বাঁধা। কিন্তু হাতে টাকাকড়ি নাই। আমার, কাছে গহনা বন্ধক রাখিয়া পাঁচশত টাকা কঙ্ক' চায়।

যাহারা পাঁতালয়ে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের দুইটা প্রধান নেশা জন্মে—ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা এবং মন্ত্রপান। রেস্ খেলিয়া অনেকে হাজার হাজার টাকা পায়—এইরূপ শুনা যায়—কিন্তু তাহা থাকে না ; যে পথে উৎপন্নি, সেই পথেই নিষ্পত্তি। রেসের দিন বেশ্যা

পল্লীতে খুব ভিড়। যে খেলায় জিতিয়া কিছু লাভ করিয়াছে, সে যেমন আমোদ করিতে সেখানে যায়—যে হারিয়া সমস্ত খোয়াইয়াছে সেও তেমন দুঃখ ভুলিতে সেখানে ছুটিয়া যায়।

আমার হাতে টাকা ছিল না। উষাবালা নামে একটি শ্রীলোক আমাদের বাড়ীতে নৃতন আসিয়াছিল, তাহার কাছে কিছু নগদ টাকা আছে জানিতাম। কালীদাসী যে গহনা আনিয়াছিল, তাহার মূল্য প্রায় এক হাজার টাকা। স্বতরাং আমার কথায় সম্ভত হইয়া উষাবালা এই গহনা বন্ধক রাখিয়া কালীদাসীকে পাঁচ শত টাকা দিল।

আমি পরে জানিয়াছি, কালীদাসী রেস্ খেলিয়া ও মদ খাইয়া সে টাকাও উড়াইয়াছে। ভাটিয়া বাবুর সংসর্গে কালীদাসাকে রেস, ও মদের নেশায় পাইয়াছিল। এই পথেই সে উচ্ছ্বস গিয়াছে। আমি আরও জানিলাম, এই নৃতন মাড়োয়ারী যুবকটার সহিত কালীদাসীর পূর্ব হইতেই গুপ্ত-প্রণয় ছিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাহার প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি রহিল না। উষাবালার ঝণ সে পরিশোধ করিতে পারেনাই।

কালীদাসী এখনও বাচিয়া আছে। সে আমারই মত তাহার পাসের 'প্রায়শিত' করিতেছে। কিছুদিন পূর্বে তাহাকে কলিকাতার কোন অপরিচ্ছন্ন বস্তীতে এক বিড়িওয়ালা মুসলমান যুবকের সহিত যেভাবে ইয়ারকি করিতে দেখিলাম—তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি; পতিতাদের শীত্র মরণ হয় কেন। সেই ২৬ বৎসরের যুবতীর দেহ ৬০ বৎসরের বুদ্ধের মত ক্ষীণ শুক্র, অস্তি-চর্ম, সার; মন্তপানের ফলে নানারোগের আক্রমণ,

পরেন একথানা কাপড়ই যথাসর্বস্ব—চুইবেলা' জাহার
জুটে না—তার উপর অত্যাচার! আমি কালীদাসীর সহিত কথা
কহিলাম না! মোহন্তজীর উপদেশ আমার মনে হইল—
“দৈবকে অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। কর্মফলই দৈব।”

উষাবালার কথা এইখানেই বলিব। সে করিদপুরের কোন
আঙ্গণ উকিলের পরিণীতা স্ত্রী, পিত্রালয় হইতে কয়েকজন ধনী মুসলমান
তাহাকে অপহরণ করিয়া কলিকাতার নিকৃটবর্তী বেনিয়াঘাটায়
রাখে। নারী-রক্ষা-সমিতির কর্মী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী
মহাশয় সংবাদ পাইয়া তাহার কর্মীদের দ্বারা ও পুলিশের
সাহায্যে উষাবালাকে উদ্ধার করেন। “এইজন্য পুলিশ-আদালতে
মামলা চলিতে থাকে। তাহার স্বান্না তাহাকে স্ত্রী বলিয়া
অস্বাকার করেন। উষাবালা কিছুদিন সঞ্চীবনী সম্পাদক, নারী-
রক্ষা-সমিতির পরিচালক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের
বাড়তে অবস্থান করে। এই উষাবালার কথাই আমি পুর্বে
একবার উল্লেখ করিয়াছি। সে আমার নিকট বলিয়াছে “কৃষ্ণ-
কুমার মিত্র মহাশয় আমাকে নিজ কল্পার মত দেখতেন। তিনি
আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করলেন; শিল্প কাজ
শিখিবার জন্য এক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু আমি কিছু-
তেই মনস্থির করতে পারলাম না। হৃষ্পত্তি দগ্ধ করা, আমার
পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে উঠল। আমার বয়ন অঠার বৎসরের বেশী—
স্বতরাং তাঁরা আমাকে আর জোর করে রাখতে পারেন না।
লালা ‘অবস্থার পাক চক্রে ঘূরে আমি এই পথে এসেছি।’ কিছু-
দিন আমাকে রাস্তায় বসে পান বিক্রীও করতে হ'য়েছিল।

মারা-নিঃহের বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হইলে আমি একজন ভদ্রলোককে প্রায়ই বেশ্যাদের ঘরে আসিতে দেখিতাম, তিনি আমাদের নিকট তারকবাবু নামে পরিচিত, পতিতাদের মধ্যে চারি পাঁচজন তাহার বিশ্বাসভাজন ছিল, আমাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমরা ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি কোন কুমতলবে বেশ্যালয়ে আসেন না। তিনি নারীরক্ষা সমিতির কঞ্চী—না পুলিশের গোরেন্ডা, তাহা জানি না; কিন্তু আমাকে তিনি বলিয়াছেন, আজকাল অনেক দুর্ব্বল গৃহস্থ ঘরের মেয়ে "বোকে চুরি করিয়া বেশ্যা গৃহে লুকাইয়া রাখে—কোন স্ত্রীলোক কলঙ্কের ভয়ে বাধ্য হইয়া প্রণয়ীয় সহিত স্বেচ্ছায় প্রতিতালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে—এই সব সন্দান লইবার জন্যই তিনি গোপনে বেশ্যাদের নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, আমরা তাহার কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম।

একদিন তারকবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমাদের সম্মুখের সমস্ত বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে যে নৃতন মেয়েটী রয়েছে, তা’র সন্ধিক্ষে একটু বিশেষ খোঁজ করে দেখিবে ; আমার প্রয়োজন আছে।” আমি তার প্রবৃদ্ধি হইতে সেই বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। অন্নদিনের মন্দেক্ষে শেয়েটীর সহিত আমার ভাব হইল। তার ভিতরের কথা অনেকটা জানিলাম।

কঁয়েকাদশ পর তারকবাবু আসিলে আমি বলিলাম, “মেয়েটি আক্ষণ বংশীয়া—নাম শুরুচিবালা, তাহার পিতা একজন অবসর-প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, এখন কাশীতে আছেন, হগলী জেলার ক্ষেত্রে আক্ষণ যুবকের সহিত শুরুচির বিবাহ হয়। শুরুচি বলে যে, তাহার স্বামী আর এক বিবাহ করিয়াছিল। শুরুচির স্বামীগৃহে

স্থান হয় নাই। সে কাশীতে পিতার নিকট থাকিত। বাল্যকাল
হইতে উপন্যাস নাটক নভেল পড়ায় তাহার খুব বেঁক ছিল।
ক্রমশঃ সে উচ্চজ্ঞল প্রকৃতির হইয়া উঠে। পিতামাতার শাসন
সে মানিত না, কাশীতে দুষ্ট লোক অনেক আছে, সুরুচি কোন
দুর্বলতের সহিত পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আসে। এখানে
অনেকের হাতে পড়িয়া সে কলুষিত হয়। পুলিশ তাহাকে আপত্তি-
জনক অবস্থায় পাইয়া গ্রেপ্তার করে, পুলিশ আদালতে তাহাকে
নেওয়া হইলে বিচারক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, নারীরক্ষাসমিতির
অক্রান্ত কম্বী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতঙ্গী মহাশয় সেদিন
অন্ত কোন কার্যা উপলক্ষ্যে আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাহাকে
বিচারক চিনিতেন তিনি মহেশচন্দ্রকে বলিলেন “আপনি এই মেয়েটিকে
নিয়ে যান, নারীরক্ষা সমিতি হঠতে ইহার ঘণ্টাচিত ব্যবস্থা করুন।”

সুরুচি কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল,
তিনি পিতৃস্মৃতে ইহাকে সংপথে আনিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন, কিন্তু সুরুচি এই সরল-প্রাণ, উদার স্বদৰ্য, মহানুভব
বাল্কিকে প্রতারণা করিয়া চলিয়া আসিল, দুষ্ট লোকের
প্রলোভনে পড়িয়া সে পাপের পথই বাছিয়া লইল। একশণে এক
ধর্মী পার্শ্ব যুবক তাহাকে বাঁধা রাখিয়া আছে, মেম-সাহেবদের “মাইলে
সে থাকে—ঘাড়ের উপর পর্যন্ত হোট করিয়া চুল ছাঁটা—হাঁটু
পর্যন্ত স্কার্ট, খোলা হাতের রং-এর সহিত মানন-সই সিঙ্কের
মোজা,—পরিষ্কার হিন্দী বলে ; ইংরাজীও কিছু শিখেছে।”

“ তাঁরিকবাবু সমস্ত মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন “সে
কৃষ্ণবাবুর বাড়ী হইতে পলাইল কেন, তাহা বুঝি জান না। আমি

বলিলাম—না—সে কথাত স্বরূচি কিছু বলে নাই। তারকবাবু
বলিলেন, ”সে কৃষ্ণবাবুর জামাতা শচৈনবাবুর একটী সোনার
ঘড়ী সরাইয়াছিল, এজন্য মহেশবাবু তাহাকে পুনরায় আদালতে
দিয়া আসেন। তথায় সে বেশ্যাবৃত্তি করিবার অনুমতি চায়,
বিচারক অগভ্য তাহাকে তথাস্তু বলিয়া ঢাকিয়া দেন।”

আমাদের একজন কথাগৰ্ত্তা হইতেছিল এন সময় স্বরূচি
হাসিতে ধাগিতে আনুবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার
হাতে নানাবিধ ফুল, ফল, কেক, বিষুটি, প্রভৃতি রহিয়াছে। আমি
তাহাকে বসতে বলিলাম, সে দাঁড়াইয়াই বলিতে লাগিল
‘মানদি, আজ ১০টোরে চড়ে হগ্সাহেবের বাজারে গিয়েছিলুম,
এই সব কিনে এনেছি, কাল সকালে আমাদের বাড়ীতে তোমার
চা-এর নিষ্পত্তি, যেও। ভাল কথা, আজ সেই বুড়ো মহেশ
আত্থার সঙ্গে দেখ হ'ল, আমি বল্লুম, কি বুড়ে কেন আছ ?

তারকবাবু স্বরূচির সম্বন্ধে কি করিবাটিলেন জানি না,
আগি স্বরূচি ও উয়ার কথা ভাবিয়া দেখিলাম, ইহারা আমারই
মত হওভাগিনা। দোবনের প্রারম্ভে প্রাণোভনের বশীভূত
হইয়া সংযমের বাধ একবার ভাদিয়া গিয়াছে—আর ত অকুল
সমুদ্রে বুঁল পাউতেছে না। ইহারাও আমার মত সৎপথে
আসিবার স্বয়োগ পাইয়াছিল; কিন্তু আমাঙ্গি মত ইহাদের
অনুষ্ঠেও গোধ হয় আরও দুঃখ ভোগ আছে তাই অনিবার্য
কর্মফল কেহ খণ্ডাইতে পারিল না।

ঃ

দশম

অভিনব পন্থা

সোনাগাছীতে আসিবার পর আমার উপার্জন অনেক কমিয়া যায়। শরীরও নানা রোগাক্রমনের ফলে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্বল হইতে থাকে, ঘরভাড়া, খাওয়া পরা ঠাকুর, চাকর, উষধাদি বাবদে বহু টাকা আমার খরচ হইত। পূজাপূর্বণও কিছু করিতাম, বিশেষতঃ সরস্বতী পূজা আমার কখনও বাদ যাইত না, আমার রোজগাবে আব কুলাইয়া উঠিত না।

একজন উকৌল ও একজন ব্যারিষ্টার আমার ঘরে আসিত, ইহারা আইন ব্যবসায়ে যেমন পরম্পর সহযোগী ছিল,—আমার কাছেও সেই ভাবেই, বাওয়া আসা করিত। আমাদের পতিতা-নারী সমাজের একটা বীতি এখানে উল্লেখ করিতেছি। বাবুর বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত কুভাবে আসক্ত হওয়া পতিত-নারার পক্ষে নিন্দার বিষয়; অবশ্য প্রলোভনের বশীভৃত "ইইয়া অনেক দেশ্য গোপনে এই নিয়ম পদ দলিত করিয়া থাকে কিন্তু পতিতা সমাজে তাহার দুর্গাম রটে। ভদ্র সমাজে অনেক সময় ষে সকল বন্ধু বিচ্ছেদ দেখা যায় তাহার কতক এই বেশ্যাপল্লীর কানুনেও বন্ধু লইয়া ঘটে, এমন কি ইহার ফলে মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত হইয়া যায়।

আমি অভাবে পড়িয়া অর্থলোভে এই দুই বকুকে প্রণয়ীন্দৃপে
গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যেও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার
ভাব দেখি নাই।

আমার এ প্রকার কার্য্যের জন্য পতিতারা অনেকে আমায় নিন্দা
করিত, আমি ভাবিতাম সমুদ্রে ঘার শয়ন, শিশির বিন্দুতে তার কি
ভয়?—পতিতাই যখন হইয়াছি তখন কলঙ্কের পসরা ত মাথায়
নিয়াছি। ‘বলিদান’ নাটকের পাগলীর সেই গানটী মনে পড়ে—,

‘কলঙ্ক ঘার মাথার মণি,
লুকান প্রেম তারই সাজে,

নরকে যখন ডুবিয়াছি তখন একেবারে ইহার গভীর তলায়
যাইয়া—দেখি পরতে পরতে কত রকমের স্বোত প্রবাহিত
হইতেছে।

ক্রমশঃ দৈখিলাম, এই উকাল ব্যারিষ্টার বাবুদের পরিচয়ে দুই
একজন উঁচু দরের লোক আমার ঘরে উপস্থিত হইলেন।
তাহাদের নিকট অনেক টাকা পাইলাম। আমার মাথাধ এক
নৃত্ব ফন্দি আসিল। আমি জানিতাম, কলিকাতায় অনেক বড়
বড় লোকের কাছে এই উকাল ব্যারিষ্টারদের যাতায়াত ও
আল্ট্রাপ পরিচয় আছে। সেই সকল বড় লোককে আমার ঘরে
আনিবার জন্য আমি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিলাম, কথা রহিল,
টাকার অর্কেক তাহারা দুইজনে পাইবে।

আমি এবারে খাঁটী বেশ্যা হইলাম। বামবাগানে থাকিতে
নিষ্পত্তির লোকেরা রাস্তা হইতে দুই একটী বাবুকে ফুস্লাইয়া
আমার ঘরে আনিত। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের শাসনে
তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সহরে ভজলোকও

বেশ্টীর দালালী করে তাহা জানিতাম। কোন কোন পতিতা নারীর নিকট আমি ভদ্রলোক দালাল রাখিবার পরামর্শ পাইয়া-ছিলাম, কিন্তু তখনও আমার বিবেক ও নীতিজ্ঞান একটু ছিল বাণিয়া তাহা পারি নাই। আজ পাপ পথের শেষ সীমায় আসিয়া হৃদয়ের অবশিষ্ট সন্ত্বাবটুকুকে পদ দলিত করিতে আৰ্মি আৱ ইতস্ততঃ কৱিলাম না।

আমাৰ উকৌল ও ব্যারিষ্টাৰ দালাল দুইটী বেশ চতুৰ ও বুদ্ধিমান দালালী কার্যে তাহাৰ খুব পটু। দিনেৰ পৰি দিন তাহাৰ অসমাৰ ঘৰে বড় বড় লোক আনিতে লাগিল। কেহ, উচ্চশিক্ষিত জমিদাৰ-পুত্ৰ, —কেহ রাজনৈতিক মেতা, কেহ খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ সমাজ সংস্কারক,—কেহ ধনী-ব্যবসায়ী। তাহাদেৱ মধ্যে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেৰ সংখ্যাক অধিক। বাংলাদেশেৰ বাহ্যকৰণে লোক ও আসিতে লাগিল।

চারিপাঁচ মাসেৰ মধ্যেই আমাৰ হাতে কিছু টাকা জমিল। আমাৰ দালালৰাও প্রচুৰ অৰ্থ পাইল। আৰি আমাৰ ঘনেৰ দিকে ঢাহিয়া দেখিলাম, আমি কতকুত্ত, কত হীন হইয়াছি, নিষ্ঠা মন্দোচ্ছি, প্রতিদিন প্রত্যৰণা—কেল অৰ্থগ্রন্থা—হৰি ফলে আমাৰ হাতয় যেন স্বাপদ সন্দুল অবগোৱ মত হইয়া উঠিল। দৰ্পণে রূপ দেখিয়া বুবিলাম আমাৰ মে লাবণ্য নাই—মে কাস্তি নাই, মৰকেৰ ঘূণিত ছবি যেন ফুটিয়া বাহিৰ হইয়াছে।

—

অভিনব পন্থা

মিস মুখার্জী

বয়েবৃক্ষির অনুপাতে সোনাগাছিতে আবার আমার গ্রাহক
অনুগ্রাহকের সংখ্যা^১ দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু
ইদিনের সে সূত্রপাতেও আমার এই উকিল ব্যরিটার, বন্ধু
আসকে ত্যাগ করেন, নাই ইহাদিগের পরামর্শে আমি স্থান
তাগ পূর্বক ভবানীপুরে আসিয়া নৃতনভাবে জীবিকা অর্জন
করিলাম। ননস্তত্ত্ববিদগণ জানেন এবং দীর্ঘকাল এই
যুগিত নাবসার^২ উপরক্ষে আমিও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া-
ছিলাম যে জগতে যাহা সুন্দর ও সহজপ্রাপ্য তাহা প্রকৃত পক্ষে
সুন্দর তইলেও তত গোহজনক হয়না; কিন্তু যাহা দুষ্প্রাপ্য ও
সর্ববাধেক দুর্ভ, তাহাই সন্ধিক প্রলোভনের বস্তু। আমি
ভবানীপুরে একটা সুরম্য ভবনে মিস মুখার্জী নামে ব্যরিটার
সাহেব ট্ৰি শ্যালিকাৰূপে সাধাৰণেৰ দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসব জমাই-
বার চেষ্টা কৰিতে লাগিলাম। কলও; ফলিল বালো এবং
কৈশোরে বিশ্ব অর্জন কৰিয়চিলাম, পৱে মানব সমাজেৰ নামা-
শ্বেতেৰ নানাপ্রকাৰ জীবেৰ সহিত অবাধ মিলনে মনুষ্য হৃদয়েৰ
অতি ঘৃত তত্ত্ব ও সংগ্রাম কৰিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, পুতৰাং মিস
মুখার্জী-ৰূপে ষথন সভ্য বন্ধু মহলে হাস্তৱিকতাৰ অভিন্নয়
কৰিতাম, যথন আপ-টু-ডেট সাজ সজ্জাৰ হাবভাব বিলাসে বিগত-
প্রায় যৌবনশীৰ নৃতন সংস্কৰণ লুক-চকুৰ সম্মুখে ধৰিতাম,

যখন পাকে হাত ধরাধরি করিয়া ভগিনীপতি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে
সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতাম, যখন একটিমাত্র কটাক্ষে
অপরিচিতকে পরিচিতের পর্যায়ভূক্ত করিয়া বাটিতে আনিয়া
স্বহস্তে পরিপাটিরূপে চা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতাম ও
সঙ্গলিপ্সার দুর্দম্য বেগ তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফুর্তি করিয়া পরম
তৃপ্তিলাভ করিতাম; যেন আমার হৃদয়ের সে আবিল স্বার্থদুষ্ট
রূপ কাহারও নয়নপথে পড়িত না, বরং উর্ণনাভের বিস্তৃত জালে
তাঁহারা আবক্ষ হয়ে আমার সহিত নিভৃত আলাপের অনুসন্ধান
করিতেন। অবশ্য বলিতে হইবে আমিও' কাহাকে?
.....। যাঁহার যখন উদয় হইত তিনিই যে আমার হৃদয়
কমলের একমাত্র ভূম্ব এবং অন্য সকলকেই মরিচৌকা লঁয়া
ফিরিতে হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিতাম।

কত সতৌহের ভানই করিয়াছি, আজ তাহা স্মরণ করিলেও
হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। একদিন সন্ধ্যার সময় সম্মথে
টিপয়ের একদিকে মিঃ গোস্বামী ও অপর দিকে প্রকেসর
চৌধুরী। উভয়েই ধনী, উভয়েই সুপুরুষ। আমি হারমোনিয়মটি
অঙ্কে স্থাপন করিয়া বেশভূষার পারিপাট্যের পরিবর্তে
ইচ্ছাকৃত একটু অঘন্তের ভাবে উন্মাদনা বৃক্ষি করিয়া গুন
ধরিয়াছিলাম—

আজি অভিসার রজনী !

কোথা সে আমার কতদূরে তার দেখা পাব বল সজ্জনি ?
প্রেমের কমল ফুটেছিল তারই আলোক রেখার পরশে
দিন দিন করি বিতানু জীবন তাহারই পাবার হরযে।
মিঃ গোস্বামী বলিলেন— এখন বলুনতো কে সে এই ভাগ্যবান !

আমি' বলিলাম—সে একটী মানস-পুরুষ, একটী আদর্শ প্রণয়া, বাস্তব জগতের কোন প্রাণী না হইতেও পারে। এমন সময় মিঃ চৌধুরী আমার পশ্চাত্তিকে আঙুলি নির্দেশ পূর্বক বলিলেন, এ যে সে পুরুষ-প্রবর আপনি আসিয়াই ধরা দিল। আমি ফিরিয়া চাহিতেই দুজনে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমি' দেখিলাম আমার উকীল বাবুর সহিত আধুনিক সমাজের একটী নিতান্ত অচল বেশধারী অর্কন্দ্রয়স্ক মাণিক। আহা তাতে ছিলনা কি ? ঘড়ি, চেন, গন্ধতেল, আতর, চস্মা, ছরি, শাল, ফুলমোজা, পানে পানে ফাটা ফাটা একজোড়া ঠেঁটি, মুখের মত চলন বলন, এবং যাহা কিংবু অশোভনীয় তার সবট। তিনি আসিয়াই বলিলেন—আমরা বাহিরে দাঢ়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার অপ্সরা কঠো-শুনিতেছিলাম। এ রূপ আর একবার শুনে ছিলাম। ওঃ—বহুদিনের কথা, এই কলিকাতা রামবাগানের মতি বিশ্বির বাড়ী। আমি পূর্ববঙ্গের একজন পাট বাবসায়ী। আমার পয়সা খায়নি এমন মেয়ে মানুষ সহরে কম। কিন্তু আজ তোমার বাড়ী যা শুন্দাম, জীবনে আর কোথাও তা শুন্দনা, তেঁমার কানাট আর ছাড়ব না। এঁরা কারা ! এই কথা বলিয়াই তিনি একটি গিনি দিয়া আমাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁদের ভাব' দেখিয়া আমি একটা ঘৃণাসূচক ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ পূর্বক উঠিয়া দাঢ়াইয়া হাঁকিলাম—দরোয়ান দরোয়ান ! দরোয়ান হাজির হইলে বলিলাম, ইকো নিকাল দেও। পরে নিজেই সে কার্যোর ভার লইয়া তাঁহাকে আমার সঙ্গে দুঃস্থিতে ইঙ্গিত করিলাম এবং রাস্তার ধারে গেটের কাছে আনিয়া

বিদ্যার দিলাম। বলিলাম, আমি শোমারই; তবে সঁয়র বুঝিয়া কথা কহিতে হয়। যাই বসিয়া ছিলেন তারা আমাকে সহোদরার মত দেখেন।

ক্রমশই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল; দুজনেই নাছোড়বান্দা। উভয়েরই ধ্যের্যের সৌন্দর্য নাই। মিঃ গোস্বামী পকেট হইতে হামিণ্টনের বাড়ীর তাঁর সোণার সিগারেট কেস্টি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, আমি কেস হইতে সৃষ্টগুলি বাহির করিয়া একটী কাগজের মোড়কে বন্ধ করিয়া কেসট আলমারী বন্ধ করিয়া বলিলাম—অন্ততঃ এই মূল্যবান জিনিয়টির অনুরোধেও আপনাকে প্রতি সন্কায় একবার মিস্মুখার্জিজ শরণাগত হ'তে হবে; কেবল যে দিন হ'তে মিস্মুখার্জিজ আপনার মেছের অভাব দেখ্ব সেইদিন এটা ফিরে পাবেন। মিঃ গোস্বামী একটু বিশ্বল ভাবে আমার দিকে ঢাহিয়া বলিলেন—সেটা কি কখনও সন্তুষ্ট হবে? আপনাকে ভুলুন? নি চৌধুরী হাসিয়া বলিলেন তাহলে কেস্টি মহাশয়ের পকেটে প্রচাবন্দনও আর করলমা দেখ্বি। মিঃ গোস্বামী তাঁর সিগারেট কেস্টির অসম্ভব জন্য অনুত্তপ্ত হইয়া একটু নারব ভাব অবলম্বন করিতেই আমি একটু আঘাত করিলাম—বলিলাম, কি রকম, বড় বাড়ীর কথা ভাবছেন নাকি? তিনি দল্লেন মে আবার কি? আমি বল্লাম—Lion's denএ (সিংহের গন্ধরে)। একটা beautiful cubএর (সুন্দর সিংহের বাচ্চা) শিকাকে—বাবেন ভাবছেন ত? তিনি what a fiction বলিয়া যাইতে উঃত হইলেই মিঃ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন—But facts are more stranger than

me retire for the night, (তা'হলে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম লাভ করি) বলিয়া দরজাটি বাহির হইবার সময় টানিয়া দিয়া গেলেন। আমার এই দালাল বঙ্গ দুটির নিজ নিজ বাসায়ে পসার হয় নাই, সেই জন্য আমার এই কার্যে তাঁহারা সহায়তা করেন, দালালির অংশ আধাআধি।

কিন্তু আশা মিটে কৈ ? খরচও সঙ্কুলান হয় না, বিশেষতঃ এই মহাপাপের পয়সারও আবার বখরাদার ছাইজন। একদিন ব্যারিস্টারকে বলিলাম—তুমি একেবারে অকর্ম। এত জাঁয়গায় জাল ফেললে একটিও রুই কাতলা গাঁথতে পারলেন। রাজধানীর আশে পাশে জাল হাতে করে ঘুরলে হবেনা, একটু দূরে যাও। যে বাঙালটি, সেই যে পাট বাবসায়ী গুহ, সেটি বেশ জবর মক্কেল ছিল, দর্শনেই এক গিনি, স্পর্শনে হয়ত পাটের সওদাগরী জাহাজও খান কতক এই গুহবরে রেখে যেত। পারবে ধরতে তাকে !

কিছুদিনের জন্য ব্যারিস্টার দালাল উধাও হইলেন। শেষে একটী প্রকাও কাও করিয়া বসিলেন। আসাম হইতে বেশ একটি ভদ্রনেশবাবী ধনবান মনুষ্য চেপ্টের করিয়া আনিলেন। তিনি চিরকুমার ব্রত প্রচারের জন্য তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই। তিনি প্রগম দিলেই আমাদিগেন আতিথ্য স্বীকার করিয়া বজানীযোগে চির-কৌমার্যের মহিলা কৌর্তন স্বরূপ করিয়া দিলেন। আমি কপটাচারে চিরদিনই অভ্যন্ত। গভীর রাত্রে তাঁহার সঙ্গে একাকী এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব বলিয়া রাত্রির জলবোগ শেষ করিয়া লইলাম।

মধ্যরাত্রে আলো জ্বালিয়া, ফ্যান্ খুলিয়া দিয়া, ঘুবক ঘুবতার
পরম্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা
বিকুক্তে কঠোর অশুভ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম।
বলিলাম, ঈশ্বরের এই পবিত্র রাজ্যে মানুষ নানাবিধ কৃতিম
উপায়ে পাপ-পথে সর্ববদ্ধ নর নারীকে আকর্ষণ করিতেছে।
উদাহরণ স্বরূপ তাঁহাকে একটী পাকেট হইতে কতকগুলি
পারিসের ছবি খুলিয়া এক একটা করিয়া দেখাইতে লাগিলাম।

যে পাকা শিকারী সে কখনও চিড়িয়ার প্রাণ বধ করেনা,
সিংহ, ব্যাঘ প্রভৃতি জবরদস্ত হিংস্যজন্তুই তাহাদের শিকারের বস্তু।

যখন ছবিগুলি দেখাইয়া, তাহার মধ্যে কোন্ অংশ কিরূপ
অশ্রাল, বিশেষভাবে তাহার বিচার করিতে লাগিলাম, দেখি-
লাম যেন তাহার আম্ফালন অনেকটা মন্দিভূত হইয়াছে, তিনি
আগত সহকারে সেগুলি যেন দুই চোক দিয়া গিলিতে আরম্ভ
করিয়াছেন। তাহার পর বলিলাম, নর নারীর বিবাহে বা
প্রণয় নিম্নে এই সব মূল্যিত কার্যই সম্পাদিত হয়। আপনি
যদি চিরকুমার ব্রত ধারণ করিয়া জীবন ধাপন করিতে পারেন
আমি আপনার সহিত চিরকুমারীরূপে এই মহান् ধর্ম
প্রচারে নহায়তা করিব। তিনি বলিলেন, একবা ছবি আরও
আছে। আমি, তখন একটী বাঞ্চি আনিয়া তাঁহার নিকট হাজির
করিলাম; তিনি উৎসাহ সহ কারে আমার নিকট এমন ভাবে
যেসিয়া, বলিলেন যে কপট চিরকুমারী আমি তৎক্ষণাতঃ তাঁহার
নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চেয়ারটি সরাইয়া^১ লই-
লাম। . তিনি বলিলেন—আপনি কিজন্ত এতগুলি ছবি সংগ্রহ
করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পাপ হইতে দূরেতে থাকি-

হইলে পাপের স্বরূপ পূর্বে চিনিয়া লওয়া প্রয়োজন, তাই এই গুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, যখন নিভৃতে এইগুলি সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ইহাদেব কুৎসিত ভাবগুলি আলোচনা করি, তখন কি একটা ঘূণিত লিপ্তা প্রাণে জাগিয়া উঠে; যেন, ছিছি সে কথা বলিতে লজ্জা মনে হয়। আপনি চিরকুমার ব্রতধারী, বলিতে লজ্জা করে, তখন মনে হয়—বোধ'হয় অতি নিকট-আংশীক বিরুদ্ধ সম্পর্কীয় একমন দুরেণগুৰী যুনকের সঙ্গও আমার পক্ষে মিরাপদ নহে।

ঘড়িতে চং চং করিয়া তিনটা বাজিল। আমি বিশ্রামের প্রস্তাব করিলাম তিনি সম্মত হইলে, উভয়ে একই কক্ষে শয়ন করিলাম, আমি নিদ্রার ভান করিয়া জীবন রহিলাম, কিন্তু জগত ছিলাম, তিনিও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। আমি পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম, তিনি মহাবনা। এক্ষণে সাড়া দিয়া পলিলাম—এই বাড়ীখানি আমি ভাড়া লইলাম, বিশ হাজার টাকা লইলে এখানি নিজস্ব করিয়া, এইখানে দু'জনে থাকিয়া এই মহামন্দের প্রচার করিতে সমর্থ হই, নচেৎ শৌগ্রহি এস্থান তাগ দিতে হইবে। তিনমাসের বাড়ীভাড়া ১০০ টাকা হিসাবে বাসী পরিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাতঃ স্বাক্ষর হইলেন। বলিলেন—যদি আপনার মত সঙ্গী পাই তবে যথাসর্বিষ্঵ এই কার্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। বুঝিলাম তাহাকে হস্তগত করিয়াছি। তখনও তাহার নিদ্রা আসে নাই আসিবার সন্দৰ্ভে ও ছিল না, তখন আমার পবিত্র ব্রতধারী, আমার জীবন সঙ্গীর একটু পবিচর্যায় নিযুক্ত হইলাম। নিকটে আসিয়া বলিলাম—মৃতন স্থানে আসিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাপাত হইতেছে;

একটু শোয়াজ করিলেই সুস্থ হইতে পারিবেন। আমার আর তখন ভয় কি ? তিনিও পবিত্র আমিও পবিত্র। তাঁহার মস্তক নিজ অঙ্গে স্থাপন করিয়া কেশগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। বলিনাম—যুবক বা যুবতীর মনের দৃঢ়তারও পরীক্ষা হও যাই আবশ্যিক। প্যারিশ ডিগ্রুলির একটি ছবির প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার মানসপটে ভাবটি চিত্রিত করিয়া দিলাম, তিনি তৎক্ষণাত্মে পার্থ পরিবৃত্তি করিলেন, আমি তাঁহার শোচনৈয় অবস্থা অনুভব করিয়া মান মনে হাসিতে লাগিলাম। আমরা পিশাচী, পৈশাচিক আনন্দই আমাদের আনন্দ। তাঁহাকে এই পর্যন্ত পাপের পথে এগাইয়া দিয়া, তাঁহারই অনতিদূরে শয়া রচনা করিয়া শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রভৃতি কি দেখিলাম ! একদিন পূর্বে যিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, যিনি কখনও কাহারও পানিপীড়ন করিলেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবক হইয়াছিলেন, তিনিই একরাত্রির মধ্যে আমার পুরুষ ভক্ত, অনুগত দাসে পরিণত হইয়াছেন। যে নারী সর্বদ্বয় অঙ্গুলিয়া ঘায় তাঁহার পরিত্যজ্য দেই নারী শিখেন্নেশ্বরী আমি বার্দ্ধবিলাসিনী মানী, ওরফে মিস মুখার্জি ভিন্ন ভাবে অন্ন রোচেন। চা আসিন' বিস্কুট আসিল, নিয়ন্ত্র পদ্ধী? •এবচোড়া ডিম আসিল, কিন্তু তাঁহার মুখ্যনেত্র আমার অনুসরণ করিতে লাগল। আমি যাইয়া যখন চা পানে রত হইলাম, তখন তিনি শৌভল চা-টুকু টোকে টোকে গিলিতে লাগিলেন।

বাড়ী ক্রয় করিবার জন্য দুইতিন মাসের মধ্যে বিশহস্তির টাকা আমার হস্তগত হইল। আমার অঙ্গ মণি কাঞ্চননাদি নানা উল্লক্ষারে ভূষিত হইল। অলঙ্কারে আমি আপত্তি করি-

লেও তাহা গ্রহ হইল না। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম—
আমিই চিরকুমারী থাকিয়া অত উত্থাপন করিব, তিনি
অনায়াসে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি
বলিলেন, আশ্রমের সেরূপ ওলট পালট করিতে আমাকে
নাকি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমি তৎক্ষণাতঃ দুই
কর্ণে দুই হস্তের দু'টি অঙ্গুলি প্রদান করিতেই, অসাবধানতা
বশতঃ তাঁহার সম্মুখে বে-আবৃক হইয়া পড়িলাম, তিনি উন্মত্তের
মত আসিয়া আমাকে গভীর আলিঙ্গনে নিষ্পীড়িত করিয়া গু-
দেশে এক-নিশাসব্যাপী চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

তারপরই একদিন সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব। আমি বলিলাম
এর কর্তা আমি নই, দাদা-বাবু। দাদা-বাবু আসামীর সঙ্গে বাঙালী
শিক্ষিতা যুদ্ধীর একপ মিলন অসম্ভব বলায়, আমার গবচন্দ
প্রণয়ীটি কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

কুমার গোপিকারমণ রায় উল্লিখিত জমিদার ঘুঢ়কের নাকি
বিশেষ বন্ধু, কুমার বাহাদুরের আলয়ে আমার হতাশ প্রণয়া নিম্নিত
হইতেন, শুনিয়াছি। ক-তদিন ইনি কুমার বাহাদুরের গৃহে আমা-
কেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা
করিতে পারি নাই। তবে কুমার বাহাদুরকে একদিনের জন্য
আমার প্রণয়ীর মারফত, আমার কুটীরে পদবৃলি প্রদাবের জন্য
অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানিনা কি অপরাধে তিনি আমাকে
ক্রত্যার্থ করেন নাই। এই সময় আমি দেশ্য বলিয়া পরিচিত ছিলাম না।
আমির এই বিচ্ছিন্ন জীবনের আখ্যায়িকার কত কথাই লিখিলাম।
মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় কত স্থগিত কার্য করিতে পারে তাহা ও
দেখাইলাম। যাহা পবিত্র, মানুষ তাহাকে কল্পিত করিতে

বিশেষভাবে চেষ্টিত। সে মুখখানি আবরণ হীন, লোকে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা, যাহা আবৃত, যাহা পাপপর্ণে মলিন হইয়া যায়, লোক তাহাতেই আকৃষ্ট। যে নারী একাশ্যভাবে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, পুরুষ তাহা চায় না। অথচ যে কুলমহিলা পাপপর্ণে সদা ভীত, পাপস্থাগন তাহাকেই পাপ পক্ষে নিমজ্জিত করিতে চায়! হায়, আমার চিরকুমার ব্রতধারীর কি পরিণামটি ঘটিল! কোথায় সেই ব্রত! কোথায় তার উত্থাপন! এত শল্লাদিনে নারী পর্ণেই তার দৃঢ় স্বদয় চূর্ণ হইয়া গেল, সকল বিকলে পরিণত হইল। তিনি ধন, মান, যশ হারাইয়াছেন, এত অল্লাদিনেই আমার চরণে দাসখত লিখিয়া দিয়া ধন্ত হইলেন। আমি কাহাকেও ক্ষমা করি নাই। সুন্দর রাজ অট্টালিকাবাসী ধনী মাড়োয়ারী মহলেও আমার বিশেষ কদর ছিল। তাহাদের কতক অর্থও আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার উকৌল দালাল একজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারিকে আনিয়াছিলেন। সে আমাকে দেখিবামাত্র বাঞ্ছিল—বিবি সাহেব, স্বজাতীয় নাদাপেটী মাড়োয়ারী নারীতে চোখাও শোভা নাই। বিদেশীয় আস্বাদেই পরমতৃপ্তি। সে আমাকে সোহাগ করিতে বলিত। আমি তাহাকে প্রাণের বলিয়া একটী করিয়া গিনি সংগ্রহ করিয়াছি। এটী চুম্বনের মূলাস্ফুর দুটী গিনি সংগ্রহ করিয়াছি। একদিন বাগান বাড়ীতে যাইয়ো আমি ৩০০ টাকা আদায় করিয়াছিলাম। যাহারা হিন্দু-ধর্মের এমন ধর্জা উড়ায় তাহারা যে এমন কামাঙ্ক, পরদার পরায়ণ, তাহা আমার সম্পূর্ণ ঘন্টাত ছিল।

একাদশ

টি-পার্টি

ভবনীপুরে উঠিয়া আসিয়াছি পর হইতে আমি মিস্ মুখার্জী
নামেই পরিচিত। আমি এখন আর “মানদা” ফিরোজা
বিবি” বা “মানো দিদি” নহি। প্রাতদিন আমি নৃতন নৃতন গতলব
অংটিতে লাগলাম। আমার এই গতলবের মধ্যে টি-পার্টি ছিল
প্রধান। অফিস ছুটীর পর আমার দালাল আসিতেন।
যাহারা আসিতেন তাহারা ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীরই হিলেন।
হুই এক ষষ্ঠি আলাপ পরিচয়েই আমার প্রয়োজনীয়
বাক্তিগোচর হাতিয়া গহিতে পারিলাম। এভাবে ধাঁহারা আসিতেন
তাহাদের দ্বারা আশার তেমন ভাল আয় হইত না, বিশেষতঃ
এদের জন্যও খরচ হইত। বড়লোকের পকেটে হাত দিতে না
পারিলে আমার ও দালাল দুয়োর কিংকরিয়া পোষাইবে।

একান্ন ব্যারিটার সাহেবের বনিলাম দেখ একটা কাজ
কর। এই কলিকাতা সহরের বড় বাবুরায়ি, বড় চাকুরে, ডেপুটি,
মুসেক, জনিদার, উকাল, ব্যারিটার, স্কুলের শিক্ষক, প্রফেসোর,
দেশকন্সার্ম, সংস্কৃতক—এদের মধ্যে যাহাদের পকেটে বেশ টাঙ্ক
আছে তাদের প্রত্যেক শ্রেণি হইতে পাঁচজন ক'রে নিম্নৰূপ
ক'রে শুণেকটা ভাল পার্টির বন্দোবস্ত কর দেখি।

ব্যারিটার সাহেব দিন চারের মধ্যে একটা লিট করিয়া

আমাকে দেখাইলেন, লিঙ্গ মধ্যে পূর্ব জীবনের পরিচিত তিনটী
ভদ্রলোকের নাম আমি ছ'টিয়া দিলাম। তিনি নৃতন নাম দ্বারা
তাহা পূরণ করিলেন। এক রবিবারে এই পাটির আয়োজন হইল।
আমার নামে ছাপান নিম্নণ কার্ড দরোয়ান দ্বারা পাঠান হইল।
ক্ষুলের শিক্ষক এই নিম্নণে একজনও আসেন নাই, মুনসেক মাত্র
একজন আসিয়াছিলেন, তিনি পাটি শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া
যান। দেশকম্পী এবং উকিল ও ব্যারিষ্টার প্রায় সকলেই আসিয়া-
ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যেও প্রায় অনেকেই আসিয়াছিলেন।
জলযোগের সামাজ বন্দোবস্ত ছিল—আর ছিল বিনাতী তরঙ্গ
পদার্থ। অবশ্য এ জিনিসটা সকলের মধ্যে পরিবেশিত হয় নাই।
এই উপলক্ষে একটা ব্রহ্মসঙ্গত এবং রবীন্দ্রনাথের চারিটী গান
আমি গাহিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায়ও কয়েকটি
গান গাহিয়াছিলেন। একজন দেশকম্পী একটা স্বদেশ-সঙ্গীত
গাহিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। আমি এই নৃতন গানটি
গাহিয়াছিলাম।

হাত দিয়ে তুই বাঁধ্লি হাত
প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁধ্লি না;
এয়ে সোণা ফেলে দিলি গের
আঁচলে তা' বুঝ্লিনা।
তিরিশ কোটি বন্ধু পেলে,
জগত জয় অবহেলে
কর্তিস্ তা আর পার্লি না।

গান শেষ হইলে রাজনৈতিক তর্কবিত্তক আরম্ভ হইল; একজন

কস্মী পদ্ম সরকারের নিন্দা আরম্ভ করিলেন—তার নাকি কোথায় দুই একটা রক্ষিতা আছে, তাহার কথা, তাহার জাল জুয়াচুরিয়ে কথা ত্বলিয়া তাহাকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্থ করিলেন। মিঃ ঘোষ ইহার প্রতিবাদ করিলে, অন্য এক দেশকস্মী মিঃ ঘোষকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না। তিনি ইহাও বলিতে একটু উত্সুকঃ-করিলেন না যে, দেশবন্ধু এসের লাই দিয়ে বড় করে বড়ই ভুল করেছিলেন। দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন—এ কথাটাতে আমার প্রাণে যেন কেমন লাগিল, তখন আমিই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—দেশবন্ধু ভুল করিয়াছিলেন কি ঠিক করিয়া ছিলেন তাহা তোমার আমার মত লোকের বুঝিবাব গতি নাই—সে অগাধ সমুদ্রের তলম্পর্শ তোমার আমার মত লোকের কাজ নয়। তিনি কাহারও উপর কোন কার্যা বিশেষের জন্য বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা পোষণ করিতেন না। তিনি লোক চিন্ত পারিতেন বলিয়াই এমন লোকও স্থান দিয়াছিলেন। যেমন—কুষ্টিগির পালোয়ানকে আয়ত্ত করিতে হ'লে কুষ্টিগির পালোয়ানের প্রয়োজন, তেমনি এই লোক স্থারও তিনি তার উপযুক্ত কাজ করাত্বার জন্যই রাখিয়াছেন।

এর পরও তিনি জেদ ছাড়িলেন না, বলিলেন “‘এ যে’ বিশ্বাস-ধাতক”—সেই প্রণাল বোধ হয় দেশবন্ধু পান নাই। এখন তার মূল্য বাহির হইয়া গিয়াছে—মহারাজা ফৌণিশের কাছে গোপনে দলের খবর এ লোকটাই দিত।...তারা দিদির প্রণয়ীর এ অপমানটাতে আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল—প্রকাশ্যে বলিলাম—আচ্ছা আপনারা শালতার বাহিরে যান কেন?

বিশেষতঃ পদ্মবাবুর অসাক্ষাতে বলা কি ভাল ! তার কথা না জানে কে, তাকে ত লোকে এই চক্ষুতেই দেখে। আজ যে পার্টিতে তাকে বলি নাই, কারণ, তাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে জানিলে স্বয়ত্ত্ব অনেক বিশিষ্ট লোক নাও আসিতে পারেন।

এই ভদ্রলোকটী আবার বলিতে লাগিলেন—‘বারেন শাসমল, জিতেন বানার্জিজ এবং হেমন্ত সরকার কেনে চলিয়া গিয়াছেন—তাহা কি আপনারা জানেন ?’ আমি তাঁকে আবার বারতে না দিয়া কোন প্রকারে থামাইয়া রাখিলাম।

মিঃ ঘোষ, ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে অন্ত ঘরে থাইয়া একটু উনিক থাইয়া আবার আসিলেন। তিনি বলিলেন—মিস মুখার্জী—কিছু মনে করবেন না। সেদিন ঢাকার কাগজে দেখা গেল—কোন মেয়ে-বোর্ডিং-এ আবর্জনার স্তুপে এক মৃত কন্দ পাওয়া গিয়াছে। ইহা লইয়া ঢাকায় মহা হৃদস্তুল। আজকাল যে একার অবাধ মেলামেশা চলিতেছে—ইহারই ফলে এ কন্দ কৈ নহে কি ? ঢাকার এক ভদ্রলোক বলিলেন, একটা নহে—ধোনী।

আমি বলিলাম—অবাধ মেলামেশা দোষের নহে—নিজকে বাঁচিয়ে ঢুলতে হয়। এই যে মেয়েগুলি আজকাল ছলেদের সঙ্গে এক কলেজে পড়ছে—দেখুন তাদের কেমন ঝুঁকি চাল চলতি, যেন ঠিক ভাই বোন। প্রকৃতির যা নিয়ম—ভাই বোন এক সঙ্গে—এরা ঠিক তাই। আমি শিক্ষিতা উদার মিস মুখার্জী, ইচ্ছার বিরক্তেও আমাকে অবাধ মেলামেশা সমর্থন করিতে হইল। নইলে আমার মান থাকে কোথায় ! অবাধ মেলামেশাৰ জন্যই আজ আমি পতিতা।

মিঃ ঘোষ তখন বলিলেন—আপনি কি বলিতে চান যে—এ সব কলেজের ছেলেগুলি সব ধর্মপুত্র যুবিষ্ঠির! পূর্ণাঙ্গী মহিলাদের কাছে সমস্ত দিন ঘুরে ফিরেও এদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় না! আমি বলিলাম—সকলের কি আর এক রক্ষ হ'তে পারে? উহাতে কাহারও যদি ভাবান্তর হয়—এবং তাতে যদি একটা কিছু হয়ই—তবুও তেমন দোষ কি? স্বাধীন দেশে ত এমন কত হচ্ছে—তাতে কি আসে যায়! ।

মিস্টার ঘোষ তখন বলিলেন—‘তবে কি আপনি এ দেশটাকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্যায় দেখতে চান?’ ইহার উত্তর কি দিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় মিঃ ঘোষ আবার বলিলেন—রুচীবাগীশ হেরম্ব বাবু নাকি ‘থিয়েটারের বাড়ী দেখাইয়া দেওয়া’ ও পাপ মনে করেন, কারণ উহাতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ যাইয়া থাকে তাহাদের নাকি মনোবৃত্তি ভাল নহে; আজ তাঁ’র কলেজে যে সকল যুবক যুবতী একসঙ্গে পড়ে, তাঁ’দের মনোবৃত্তি কেমন, তাহা যদি তিনি ‘ব্যালটে’ পরীক্ষা করেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন। হেরম্ববাবু কি অবাধ মেলা-মেশার ফলে ঢাবার দুটি ত্রাঙ্ক পরিবারের বিনাহের ফল এবং তজ্জন্ম এক পরিবারের পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণের বিষয় অবগত নহেন? রমলা গুপ্তা, লীলাবতী প্রভৃতি মোকদ্দমার বিষয় কি তিনি শুনেন নাই? রমলা গুপ্তা ত তাঁহাদেরই সমাজের লোক!

এ বিষয়ে আমি আর বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেছিলাম না—বিশেষতঃ রাত্রি অধিক হইয়াছিল। ক্রমে অনেকেই বিদ্যায় গ্রহণ করিলেন, একটি খন্দর পরিহিত যুবক রহিয়া গেলেন।

ইনি এখন 'কৌমার্য' ব্রত পালন করিতেছেন—এর ও বাজারে^১
যথেষ্ট-সুনাম আছে। ভাবিলাম, এদের মত কুমার এবং আমার
মত কুমারীর সংখ্যা যদি এমন ভাবে বৃদ্ধি হয় তবে এদেশের
কি শোচনীয় পরিণাম !

গার্ডেন পাটি'

আমি 'নিজে পতিতা—তা'র উপর আবার সাজিয়াছি ভদ্র-
ঘরের কুমারী, এই প্রকার জুয়াচুরী আর ভাল লাগিতেছে না।
আমার হাতে হাজার কয়েক টাকা জমিয়াছে। এ হীন পাপ
বৃত্তি আর করিব না কল্পনা করিতে ছিলাম, কিন্তু আমার দালাল
দুইজন ইহাতে অসুখী হন দেখিয়া অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে
লিপ্ত আছি।

দেহ বিক্রয় করিবার জন্য বার বার আমায় প্রলুক্ষ করিয়াছিল
রাণীমাসী, সেজন্য তা'কে ততটা দোষ দেওয়া হয়ত চলেনা,
কারণ উহাই ছিল তাহাব বাবসায়। কিন্তু আমার এই দালালস্বয়,
যাহারা ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া পরিচিত এবং উচ্চ শিক্ষার
ডিগ্রি যাদের আছে, তা'দের এই প্রকার প্রবৃত্তির বিষয় যথন
ভাবিতাম, তখন মনে হইত—হায় এ জগতের কি কল্যাণ আছে !
যে জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যার দালালি
করে—দালালি করে কেন, বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে
দেখিলে তাহাকে এই পাপ বৃত্তি করিতে প্রলুক্ষ করে, তাহারাও
ভদ্র এবং শিক্ষিত। আমি দেখিয়াছি, বারবনিতা সমাজেও কেহ
এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে চাহিলে, অনেক পতিতা তাহাকে সাহায্য করে

করিয়া থাকে, কিন্তু ভদ্র-নাম-ধারী লোকের একি প্রবৃত্তি !
 সেদিন রামবাংগানের অবস্থাপন্ন পতিতা-নারী চুণী গলায় দড়ি দিয়া
 আত্মহত্যা করিয়াছে ; তাহার আত্মহত্যার কারণ মে এক চিঠিতে
 লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল—“পতিতার জীবনে আমার ধীর্ঘাব
 জন্মিয়াছে :” সে অন্তর্গত পতিতাকেও এই বৃত্তি পরিতৃপ্তি করিতে
 উপদেশ দিয়া গিয়াছে। যে পাপবৃত্তি করিতে প্রাণ আর চাহে না,
 তাহাতে নিষ্পত্তি থাকিতে যে কি কষ্ট, তাহা, কাহাকেও বুঝান যায়
 না। একদিন আমার উকিল দালালটি বলিলেন—দমদমায়...
 বাবুর নামানে একটা পার্টি দিব ঠিক কৰিয়াছি। আমি বলিলাম
 —দমদমায় আর কেন, যদি দিতেই হয় তবে বাড়াতেই দাও।
 তিনি শুনিলেন না, বাগানেই ভাল লোক আসেন, ইহাই বুঝাইয়া
 বাগানে পার্টির উচ্চোগ করিলেন। আমার নামে নির্মিত নিম্নোৎসুক
 পত্রও বিস্তৃত হইল, কিন্তু কাহারা যে নির্মিত হইলেন সে খবর
 আমি নেই নাই। অনিচ্ছায় যে কাজ, তাহাতে তেমন উৎসাহ,
 উদ্বৃত্তি, থাকে না। নির্দিষ্ট দিনে আমার নিজের মোটরে
 দমদমায় গেলাম। মোটর ঢালাইলেন খোদ ব্যারিষ্টার সাহেব।
 আমি ঠার বামদিকে বসিয়াছিলাম, উকিল বাবু, ছিলেন
 আমাদের পিছনে।

দমদমায় যাইয়া দেখি সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের
 ২০১২৫ জন লোক বসিয়া আছেন। কয়েকটি খদর পরিহিত যুবক
 নানা আয়োজনে ব্যস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কারা !
 উকিল বাবু বলিলেন, ইনি পার্টির খরচ দিচ্ছেন... বাবু, এরা
 তাহারই লোক। যিনি খরচ বহন করিতেছেন তাহারও খদরের

জামাৎ কাপড় এবং পায়ে স্থানেল দেখিয়া মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম। কারণ নিন্দিত পল্লীতে থাকিতেও এই প্রকারের খদ্দর পরিহিত বহু যুবক, প্রোচের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ধারা আয় হইয়াছে সামান্য। পুলিশগুলি যেমন এসকল পল্লীতে তাহাদের পোষাকের দাপটে কাজ সারিয়া যায়, খদ্দর পরিহিত দেশকম্বৰ্মী ভলান্টিয়ার নামধারী অনেক যুবকও বলে —আমরা দেশের কাজে ব্রতী, পয়সা পাব কোথায় ? অনেক কবি এবং সাহিত্যিকের দলও রিয়েলিষ্টিক আর্টের র্থেজে নিন্দিত পল্লীতে যাইয়া মার্জিত কথা বলে, এবং বিনা খরচায় আর্টের স্বরূপ বুবিতে চেষ্টা করে, স্বতরাং আমার বিরক্ত হওয়াটা যে খুব অন্যায় হইয়াছে তাহা অন্ততঃ কোন ব্যবসায়ী লোক মনে কৃরিবেন না।

দেদিন শিষ্টতার খাতিরে একটা গান গাহিলাম। আমার পরে অন্য দুই একজনও গান ধরিলেন। গান শেষ হইলে নারী নিশ্চেরের কথা উঠিল—সকলেই ইহার জন্য তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। মন্তব্য প্রকাশের প্রধান কারণ মুসলমান সমাজের নৌরবতা। একজন মুসলমান ভদ্রলোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া, যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম এই—হিন্দু নারীগণই মুসলমানদের পঙ্গে যায়, ইহা মুসলমানদের দোষ নহে। মৌলবী আক্রাম খাঁ ও এই প্রকার কথাই তাহাদের আছত প্রতিবাদ সভায় বলিয়াছিলেন। এই পাটি যেদিন হইয়াছিল তাহার কয়েকদিন পূর্বের কাগজেই ময়মনসিংহ সহরের ওভারসিয়ার শিফিত মুসলমান আক্রুল রহিমের অবিবাহিতা কল্পা এবং কঢ়িহাদি থানার

গোলাম সাহেবের স্তুর নির্যাতনের খবর দেখাইয়া বলিলাম, ‘ইহারা কি হিন্দু ছিল—না—হিন্দু ইহাদের অপহরণ করিয়াছে! আক্রান্ত খাসাহেবকে একটু ভাবিয়া ইহার উপর দিতে বলিবেন কি? আকুল রহিম সাহেবের এই কণ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য হিন্দুগণ যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন তেমন প্রাণপন্থ চেষ্টা মুসলমানগণও করেন নাই। থানার দারোগা ঘোষাল মহাশয়ও হিন্দু, তিনি এজন্য আসমুদ্দ হিমাচল মস্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব এ বিষয়ে আব কোন জবাব দিতে না পারিয়া মৈনিক-কবি নজরুল ইচ্ছলমের বিবাহটা উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন, এবং হিন্দুর দোষেই এ বিবাহটা হইয়াছে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন ‘নজরুল কি মেয়ের ভাইএর নিকট এ প্রস্তাব নিয়া প্রথমে যাইতে সাহসী হইত যদি সে...আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, যাহাদের কোন শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কথা উল্লেখ করা উচিত নয়, আপনি এ বিষয়ে কোন কথা বলিবেন না। তিনি বেশ একটু রাগের ভাব দেখাইয়া চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম উহা এক মাত্র অবাব মেলা মেণার পরিণাম, যদি বিবাহটা আরও কিছু দিন টিকিয়া যায় তবে হয়ত বা পাকা হইলেও হইতে পারে।

এই মৌলবী সাহেবটি এমনই নিলঞ্জ যে আবার বলিতে লাগিলেন—আজকাল রাস্তা ঘাটে যে সকল হিন্দু-মেয়ে বে-আবক্ষ চলা ফেরা করেন, তাহাদের অনেকের ডানদিকের অঙ্গ বিশেষের উপর ইচ্ছাপূর্বক সাড়ী না দিবার কারণ কি? আমি লঙ্ঘায় ‘জড় কাটিলাম। একথার কি উত্তর দিব। পতিতাগণও যে অঙ্গ রাস্তায়

চলিতে সাবধানে ঢাকিয়া চলে, আজকাল গৃহস্থ কুমারীও বিবাহিতা দিগেন। অনেকে উহা খোলা রাখা ষেন ফ্যাসান মনে করেন। ইহার উত্তর নাই। বেশ একটু রুক্ষ মেজাজে তঁহাকে বলিলাম—মহিলাদের সম্মান রাখিয়া যিনি কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার কথা না বলাই উচিত।

আমার এই কথায় কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান একসঙ্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রহিলেন দুই এক জন। ধিনি পাটিদাতার অন্তরঙ্গ বঙ্গ এবং হিন্দু মুসলমান মিলনের বিশেষ কর্মী বলিয়া আমার দালাল আমাকে তাঁহার নিকট পরিচয় করাইয়া দেন, তাঁহার মতলব আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি আমার দালালকে ঘৃণাভৱে গোপনে বলিলাম; এ পাপবৃত্তি আজই শেষ, আর না। নিন্দিত পল্লাতেও যাহাদের গ্রহণ করি নাই আজ তুমি তাদের নিয়ে এসে হাজির! ধিক তোমাদের শিক্ষায়! দালালটি বলিল এ নাহ'লে যে হিন্দু-মুসলমান মিলন হয় না, তাই এদের বাদ দিয়ে পাটি দেওয়া ভাল নহে। তাহাদের প্রকাশ্যে কিছু বলিলাম না, লোকটার রুচি যেন মার্জিত বলিয়াই মনে হইল।

এমন সময় কেহ কেহ সর্দার বিলের বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমার আর উহাতে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু গায় পরে যখন আমার মতামত জানিতে চাহিল তখন আর ক করি! আমি যে শিক্ষিতা উদার নারীর আবরণে নিজেকে গকিয়া কথা কহিতে ছিলাম, তাহা ভুলিয়া গেলাম। ত্যুমাদের প্রতিতা সমাঙ্গে যে হাজার হাজার কুমারী মেয়ে প্রথম ঘৌৰন

উভের সঙ্গে সঙ্গে ঘোনলিম্পা চরিতার্থ করিতে' না পারিয়া প্রবৃত্তির তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবৈধ প্রেমে-মজিয়া নিন্দিত পল্লীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে—তাহাদের কথাই মনে হইল। মনে হইল যাহারা নিজেদের কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখিতে পারে নাই তাহারাই ত এখানে আসিয়াছে, তাহারুচি সমাজের অতি সামান্য অংশ মাত্র। এ প্রকার গুপ্ত প্রেম কয়টা ধরা পড়ে ? হাজারে দু-একটা বইত নয় ?

প্রকাশ্যে বলিলাম—প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে রঞ্জোদুর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যথন মেয়েদের প্রবৃত্তি জাগরিত হয়, তখন ইহার পূর্বেই বিবাহ দণ্ডয়া উচিত। মৌলবী সাহেব 'বলিলেন—মিস্‌ মুখাজ্জির মুগ্ধে এমন উভয়ের আশা আমরা করি নাই। আমি বলিলাম—আমি কেন—এ সেদিন যে নারীবাহিনী সর্দার বিল সমর্থন করিতে ও উনহলে গিয়াছিল, তাহাদের ধাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাও আমার মতেরই প্রতিক্রিয়া করিবে। আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—চাকার ছাত্রী নিবাসের ক্ষেত্রগতি, দাস, গুহ পরিবারের অবৈধ বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বড় ঘরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলাম। মৈয়দ ছন্দনের সঙ্গে নেহরু কল্যানের পালায়নের কথাটাও বলিয়া ফেলিলাম।

শাস্ত্র আমি জানি না, জানিতেও চাহি না, কিন্তু প্রাণে ক্ষুধা থাকিলে যদি পুধার পাত্র সম্মুখে পায় তবে এমন বীর নারী কয়েজন আছে যে বৎসরের পর বৎসর তাহা গ্রহণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় ? ইংলণ্ড, আমেরিকায় কি দেখিতেছি, সেখানে প্রতিশতে কুড়িটা ছাত্রী বিবাহের পূর্বে সন্তান প্রসব

করে; ইহাতে তাহাদের সমাজচুক্তি হইতে হয় না। যদি ভারতকে তোমরা আমেরিকা করিতে চাও, তবে সে ভিন্ন কথা।

মৌলবী সাহেব তখন আলবাট হলে মেয়েদের সর্দার বিবাহ বিল সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—এই সে দিন ২১৩ শত মহিলা খুলবাট হলে মিলিত হইয়া “তালাক” আইনটাও পাশ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এর উত্তর আমি আর কি বলিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। হায় হিন্দুনারী, আজ তোমার এ কি মনোবৃত্তি! তোমারা যে দেখছি সারা ভারতটাকে সোণাগাছিতে পরিণত করতে পারলে পরিতৃপ্ত হও। একবার কোন জবাব না দিয়া বলিলাম—চতুর্দশ বৎসরের পূর্বে কণ্ঠার বিবাহ দিবার জন্য অভিভাবককে কেহ যখন বাধ্য করে না, যদি উহা অকল্যাণ মনে করেন, তখন দেশকে বুকাইয়া সেই বাদশ্বা করা উচিত। তাহা না করিয়া পুলিশের হাতে হিন্দুর ঘোন ব্যাপার যাহারা দিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহারা দেশের ঘোর শক্তি। বিশেষতঃ আমরা যখন শীঘ্ৰই স্বরাজ পাইতেছি, তখন এ কয়টা মাস সবুর করিলে কি চলে না?

সেইদিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম—এ পাপ ব্যবসার আর করিব না। রিপু জয় করিতে পারি নাই বটে, চেষ্টা করিব। আমি এখন পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার যে টাকা আছে তাহার দ্বারা আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় চলিতে পারে। কবে মরিব ঠিক নাই—হয়ত আমার ধন আমার নিজ কার্যে ব্যয় না হইতেও পারে। দালালদ্বয় একটা উইল করিতে বলিলেন—আমি তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটা খসড়া প্রস্তুত করিতে

বলিলাম। খসড়া পড়িয়া দেখিলাম—আমার মৃত্যুর পর তাহারা আমার ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—এই প্রকার লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম—তাহা হইতে পারে না—আমার মৃত্যুর পর—পতিত ও অন্ত্যজ জাতির সেবায় আমার ত্যজ্য সম্পত্তি বায় করিতে হইবে। পতিতার ত্যজ্য সম্পত্তি গবর্নমেণ্ট নিয়া যান—তাহাতে পতিতার ইচ্ছান্তরূপ কোন কার্যই হয় না—এজন্তু কলিকাতার কয়েকটি পতিতা মৃত্যুর পূর্বে—হিন্দু-ধর্মের যাঁহারা সংক্ষারক এমন প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন—আমিও তাহাই করিব শির করিয়াছি। হিন্দুসভা এবং হিন্দুমিশন, এই সকল কার্যে বিশেষ অগ্রণী।

সমাপ্ত

পুস্তকের 'শত শত অভিমত মধ্যে কয়েকখানি প্রদত্ত হইল।

গোড়াভূষণ বৈক্ষণব সম্মালনীর সভাপতি হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা প্রতু-
পাল শ্রীশুক্র অতুলকৃত্ব গোস্বামী মহাশয়
লিখিত ছেন—পতিতার আত্মচরিত পাঠ করিলাম।.....ঠিক
সময় বুঝিয়া গ্ৰহণ কৰা হইয়াচে।.....জননীর স্তন হইতে
শিশু সন্তান দুঃস্ট গ্ৰহণ কৰিয়া থাকে কিন্তু জলোকা বা ছোক সেই
স্তন হইতে কুমির ভিন্ন ধাৰ কিছুই বাহিৰ কৰিতে পাৱে না। এই
আত্ম চৰিত হইতেও লইতে পাৱিলে—লইবাৰ মত অনেক জিনিস আছে,
কিন্তু তাহা কি সকলে পাৱিব?

বঙ্গৰ অবিভৌষণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায়
শ্রীশুক্র পাৰ্বতীচৰণ তক্তার্থ মহাশয়
বলেন—পৃষ্ঠিতাব আত্মচরিত পুস্তকখানা পাঠ কৰিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।
অধুনিক ধৰ্ম বিপ্লব কালে এইরূপ পুস্তক দ্বাৰা হিন্দু সমাজের পক্ষে
বিশেষ উপকাৰ হইবে সন্দেহ নাই। সৰ্বান্তকৰণে উক্ত মানদাকে
ধৰ্মবাদ দিতাছি।

* * *

'চাকাৰ শোক্তি' মাসিক পত্ৰিকাৰ সম্পাদক ও বৈক্ষণব সমা-
জেৰ অন্যতম নেতা সুপ্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক
শ্রীশুক্র ষ্ণোগেশচন্দ্ৰ দাস অগ্ৰহায়ণেৰ শাস্তি পত্ৰিকাৰ
লিখিয়াছেন—

....বইখনিৰ প্ৰতিপাদ্ধ বিষয় এই যে, মাথাৰ উপৰ অভিভাৰক
নৃথাকিলে এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলে অ বিশ্বার মেঘেৱা চলচ্ছিন্দিৰ
মত তৰল আহোদৈৰ দ্বাৰা এবং তৰণজাতীয় নাটক, নভেলেৰ আলোচনা
দ্বাৰা যে কি শোচনীয় পৱিণাম ঘটিতে পাৱে তাহাই সাত্যকাৰ জীবনেৰ
অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা অৱিষ্যা দেখান।বইখানাৰ বিশেষত্ব এই যে,
ইহাতে পাপকে attractive কৰিবাৰ artistic প্ৰয়াস নাই। পত্ৰিকাৰ
জীবনেৰ অনেক সুশোভনকৰ্মহই ইহাতে খোলাখুলি বৰ্ণনা আছে সত,

কিন্তু “মোপাশাৰ” মত ধারণা অশৈল চিত্ৰকে রঞ্জন কৱিয়া তুলিবাৰ প্ৰয়াস নাই.....বিচাৰ কৱিতে লইলে লেখিকাৰ সংষত ভাষাৰ প্ৰশংসা না কৱিয়া থাকা যায় না। আলোচিত বইখানিৰ সুৱ যে বৰ্তমান তক্ষণ বথা সাহিত্যেৰ অনেক বই হইতে স্বাস্থ্যকৰ, তাহা বোধ কৱি সাহস কৱিয়া বলা যায়। তাই আমৰা সমাজেৰ কৃচিবাগীশ দিগন্দেক বইখানা নিৱেপক্ষভাৱে পাঠ কৱিয়া দেখিতে অনুৰোধ কৱি।

‘অমৃতবাজাৰ পত্ৰিকা’—২৪শে নভেম্বৰ—It may be anticipated that the reading of the book may have a moral effect on the readers ..It contains nothing but some revelations of some evils which is persistent in the modern Hindu society at present—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পোষ্ট গ্ৰাজুয়েট বিভাগৰ অধ্যাপক নিঃ
মৌগত সুগন্ধকান্তি বলেন—Its each and every chapter contains good lessons for our young generations. I hope to see it translated in to all the Indian Vernacular as soon as possible— * * *

বঙ্গায় ব্ৰাহ্মণ সভাৰ ভূতপূৰ্ব সম্পাদক, যদ্যপি মেমৰ টেকনিকেল
উন্সটিউটেৰ অধ্যাপক ও Religious Instructor—

শ্ৰীযুক্ত সতীশচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি এল মহাশয়
বলেন—

বৰ্তমানে ছাগ-তাৰ্ত্তিক সাহিত্যেৰ প্ৰাণেৰ দিনে এ আতীয় পুস্তকে
না জানি কি বিভৎসন দৃশ্যই চক্ষুতে পড়িয়ে, এটি ভৱ হওতেছিল কিন্তু
আশচ্যোৰ বিময় তাৰ স্থলে সৰ্বত্রই এই একটা কক্ষন ছবি দেখিতে
পাইয়া একটা স্বন্তি অনুভব কৱিলাম; এই গ্ৰন্থৰ্যায়ে আত শুকোশনে
এই সকল দৃশ্য সাধাৱণেৰ সম্মুখে উন্বাটি কৱিয়া সাধাৱণেৰ দুদয়ে
একটা সাৰধানতাৰ ভাৱ জাগৱিত কৱিব; দিবাচেন বৎসন্ত ঠাঁঠকে
অশেষ ধৰ্মবাদ দিতেছি।

আজ যে আমাদেৱ কি আধ্যাত্মিক কি শিক্ষা-নৈতিক কি রাজনৈতিক
সকলদিকে নানাঙ্গপ প্ৰচেষ্টা সহেও কোন ইফণ ফলিতেছে না এই
গ্ৰন্থে তাৰ অনেকটা সমাধান কৱা হইয়াছ।

সিন্ধি সতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশ ভঙ্গামির দ্বারা প্রতারিত হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খুব আশা করা যায় যে এই শ্রান্তপাঠে অনেক ভঙ্গ আপনাদের স্বরূপ দর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করিবেন এবং জনসাধারণও নিজেদের ও আপন আপন আকীলমুগ্ধণের পরিচালক নির্বাচন করিবার পুরুষ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

এই পৃষ্ঠাক দেশের লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া যে সমাজের ক্ষত্রীয় মহোপকার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থের বহুল ধোর একান্ত প্রার্থনায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক মিঃ বি, এন, চক্রবর্তী ডি, এস, সি ; পি, আর, এম মহাশয় বলেন—

‘প্রতিকার ‘আভ্যন্তরীন’ নামক পুস্তকখানি পড়িলাম। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম ইহাতে দাখারণের নৈতিক অবনতিজনক কিছুই নাই। ‘নোবেল’ পুস্তকের প্রাপ্তি আনাতোল ফ্রাস, পুটহাম হুন প্রত্তি পাশ্চাত্য সাহিত্যারগণের শত শত পুস্তকের মত ইহাতে অশ্বালতা জ্ঞাপক কিছুই নাই। জনরব যে পুস্তকখানির প্রচলন বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু নৈতিক জ্ঞান বলিতে আবিরায় তাহা বুঝি তাহাতে বালিতে পারি ইহার প্রচলন বন্ধ করিবার কিছুমাত্র হেতু আই।

বাংলার অন্যতম জননায়ক, অধ্যাপক মনস্বী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় এম, এল, সি মহাশয় বলেন—

‘প্রতিকার আভ্যন্তরীন’ এর সাহিত্যিক সম্পদ এবং ইহাতে যে সকল গৃঢ় রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার মর্ম না বুঝিয়াই পুস্তক খানিকে বাজেয়াপ্ত করাইবার জন্ত কোন এক দল বিশেষ উঠিয়া পড়িয়া আগিয়াছেন।

আমি বলিতে পারি বাজেয়াপ্ত করিবার বা সেৱণ কোন প্রকার শুভ্রতর প্রণালী অবলম্বন করিবার মত কিছুই এই পুস্তকে নাই, পক্ষ্যুক্তরে পুস্তকখানি অত্যন্ত সংযত ভাবে লেখা হইয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণক্রমে অশ্বালতা বর্জিত।

ঘোরতর কুচি বিগ়ৃহিত এবং চিত্র চাঞ্চল্যকরণকত পুন্তব্যে প্রতিদিন ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ হইতে প্রকাশিত হইতেছে কেহ তাহার খোঝও রাখে না, অথচ কেন যে সাহিত্যের আসর হইতে এই বই খালিকেই সরাইয়ে দিবার চেষ্টা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীযুক্ত হেন্ড্রেকুমার সরকার এম, এ, মহাশয় বলেন—

শ্রীমতী মানদা দেবীর ‘পতিতার আত্ম-চরিত’ নামক গ্রন্থানি পড়িয়, সুখী হইলাম। বাস্তবিক সত্য ঘটনা যে উপন্থাসের কাহিনী অপেক্ষাও অন্তুত তাহা এই গ্রন্থ পাঠে উপলব্ধ নয়। আমাদের সমাজে নারীর অপরাধের ক্ষমা নাই, কিন্তু সমাজের নেতা পুরুষগণ লক্ষ পাপ করিয়াও নিজেরা মান সম্মানের সহিত অবাধে চলা ফেরা করিতেছেন। এই বৈষ্ণব্যর প্রতিকার অবিশেষে ইওয়া বাঞ্ছনীয়। অশ্বালতা বর্জন করিয়া এবং ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখিয়া যে সমস্ত বড় বড় গোকের কীর্তি-কাহিনী প্রকাশ করা হইয়াছে, আশা করি তাহাতে সকলের চক্ষু ফুটিবে ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।

গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্তর্ভুক্ত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং ‘ভারতের সাধনা’ পত্রিকার সম্পাদক, সমাজ হিতৈষী শ্রীযুক্ত বিধৃত্বণ দত্ত, এম, এ, মহাশয় বলেন—বাংলা সাহিত্যে ইদানিঃ অনেক কিছু প্রবেশ করিয়াছে যাহা ‘আটে, এব দোহাই দিয়া সাহিত্যে শৰ্যাতান্ত্রিকার করিয়াছে,—অনেক মহারগী ইহার চালক।.....সমাজের বাস্তব চিত্র দর্শনে লোক শিক্ষার নিমিত্তই এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপযোগীতা থাকিতে পারে। উপন্থিত পুন্তকে ‘আটে’এর মেঝে দোহাই নাই, সমাজের অতি শোচনীয় কর্তকগুলি প্রশ়্না সাক্ষাৎ দিগ্দৰ্শাইয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা রাখিয়াছে।...সমাজ শিক্ষার উৎপোজ্ঞতা আছে।

—